# হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা

শ্রীসুকুমার রঞ্জন দাশ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

# বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিত্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্ব-ভারতী এই দায়িত্বগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

। ১৩৫২ ।

৩৭. হিন্দু সংগীত : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশ গুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫. নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪৬. প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা : ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭. সংস্কৃত সাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮. অভিব্যক্তি : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪৯. হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা : ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ

# হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা

শ্রীসুকুমার রঞ্জন দাশ
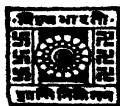
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

বৈশাখ ১৩৫৩

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীনগেন্দ্রনাথ হাজরা
বোস প্রেস, ৩০, ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলিকাতা

# সূচীপত্র

# প্রাচীন যুগের জ্যোতিষশাস্ত্র

গ্রীক দার্শনিক সেনেকা বলেন, "মানব এই অনন্ত তারকাখচিত নভোমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভ্রাম্যমাণ গ্রহ-উপগ্রহদিগের গতি ও পর্যটন নিরীক্ষণ করিলে নির্বাক্ বিস্ময়ে অভিভূত না হইয়া থাকিতে পারে না, এবং সেই অপূর্ব সৃষ্টিকুশল বিশ্বরচয়িতার উদ্দেশে ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিয়া থাকে।" তাই মানবসভ্যতার সর্বপ্রথম বিকাশের সময়ে যখন জ্ঞানরবির উষার ছটা সবেমাত্র দেখা দিতেছিল, তখন হইতেই এই অতি-প্রাচীন বিজ্ঞানের প্রতি মানবের দৃষ্টি পড়ে। সেই অতি পুরাকালীন যুগেও সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মহিমময় বর্ণ বৈচিত্র্য ও রজনীর স্বপ্নমাখা শোভাসমৃদ্ধি নিরপেক্ষ দর্শকের মনেও বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়া তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়াছিল। সেইজন্যই সর্বশক্তিমানের নিকট প্রথমেই এই মিনতিপূর্ণ প্রশ্ন আসিল—

ভগবন্ কিং প্রকারা ভূঃ কিমাকারা কিমাশ্রয়া।<br>
কিং বিভাগা কথং চাত্র সপ্তপাতালভূময়ঃ ॥<br>
অহোরাত্রব্যবস্থাঞ্চ বিদধাতি কথং রবিঃ।<br>
কথং পর্যেতি বসুধাং ভুবনানি বিভাবয়ন্ ॥

হে সর্বশক্তিমান্, এই পৃথিবীর পরিমাণ কত? ইহার আকার কিংবিধ? ইহাকে কে ধারণ করিতেছে? ইহার কি-কি বিভাগ আছে? ইহার মধ্যে সপ্তপাতাল-ভূমিই বা কোথায়? সূর্য হইতে অহোরাত্র কি প্রকারে হয়? বিভিন্ন ভুবন প্রকাশ করিয়া তিনি কিরূপেই বা পরিক্রমণ করিতেছেন?

ঋগ্‌বেদের সূর্য ও উষার স্তুতি এবং গ্রহ-উপগ্রহগণের বন্দনাসমূহ সম্ভবতঃ এই অসীম নভোমণ্ডলের পরম বৈচিত্র্য ভাষায় প্রকাশ করিবার সেই প্রাচীনতম মানবজাতির অস্ফুট চেষ্টামাত্র। যদিও সেই মহাবৈচিত্র্যের যবনিকা তখনও অনপসারিত ছিল এবং এখনও অনেকটা অনুদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে, তথাপি ইহার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য, একটা মিল লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এই সামঞ্জস্যই প্রাচীনতম মানবকে আকাশে গ্রহগণের গতি নিরীক্ষণ করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল,— যেন কোন্ ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণেই মানব নভোমণ্ডলে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রগণের দৈনিক গতি পর্যবেক্ষণ করিতে এবং পার্থিব জড়বস্তুর সাহায্যে পৃথিবী ও ব্যোমের দৈনিক পরিদৃশ্যমান সন্ধিস্থল এবং ভ্রাম্যমাণ গ্রহগণের আবির্ভাব ও তিরোধানের স্থানসমূহ নির্দেশ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। যেমন একদিকে এই নৈসর্গিক ব্যাপারসমূহ একটা চমকপ্রদ সামঞ্জস্যহেতু মানবের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল, সেইরূপ অপর দিকে উহা মানবের দৈনিক জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতার সহিত এমন সূক্ষ্মভাবে জড়িত ছিল যে, উহাদের তত্ত্ব নির্দেশ করিবার জন্য কোনরূপ মানযন্ত্র আবিষ্কার করা সেই প্রাচীনতম যুগেও জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণে বেলি সাহেব তদ্‌রচিত "হিন্দু জ্যোতিষ" শীর্ষক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ, খ্রীস্টপূর্ব তিন হাজার বৎসর পূর্বেও ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক উপায়ে গ্রহগণের গতি পর্যবেক্ষণ করা হইত। এমন কি, কেহ কেহ বলেন, বেদের যাগযজ্ঞও জ্যোতিষগণনার ফল-প্রসূত। অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এমন কি, বৈদিক যুগেও ভারতবাসীরা জ্যোতিষশাস্ত্রের বহুল উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন; কারণ, আমরা দেখিতে পাই যে, বৈদিক যাগযজ্ঞ নক্ষত্র ও চন্দ্রসূর্যের পারস্পরিক অবস্থিতির দ্বারা নিয়মিত, এবং সেই ধর্মোদ্দেশ্য সাধন

করিবার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পর্যবেক্ষণ একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

সেই অতি প্রাচীন যুগে বিশেষ কোনরূপ মানযন্ত্রের সাহায্য না লইয়া চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণ নির্ধারণ করাই জ্যোতিষশাস্ত্রের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কোন্ স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুগণ চান্দ্র ও সৌর-গ্রহণ নির্দেশ করিবার সামর্থ্যলাভ করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত তথ্য এখনও আমরা অবগত হইতে পারি নাই; সেই পুরাকালেও তাঁহারা গ্রহণসমূহের আরম্ভ ও পরিসমাপ্তির যথাযথ সময় এবং গ্রহণযুক্ত চন্দ্র ও সূর্যের পরিবর্তিত আকারসমূহের পরিমাণ নির্ধারণ করিবার নিয়মাবলী অবগত ছিলেন; এবং যদিও সাধারণ জনগণের ভ্রান্তিপূর্ণ বিশ্বাস চন্দ্রগ্রহণ ও সৌরগ্রহণের বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের উপর একটা ভীতিমূলক কুসংস্কার-জাল আরোপিত করিয়া রাখিয়াছিল, তথাপি হিন্দু জ্যোতিষিগণ উহাদের যথাযথ কারণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই "সিদ্ধান্ত-শিরোমণি" নামক গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে আমরা সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ এরূপ সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাই। এই স্থলেই সৌরগ্রহণের একটি বিশিষ্টতার উল্লেখ করিতে গিয়া "সিদ্ধান্ত-শিরোমণি"কার বলিয়াছেন, সূর্য ও চন্দ্র উভয়েরই বৃত্তাকার অবয়ব; কিন্তু সূর্যের আকার চন্দ্রের আকার অপেক্ষা অনেক বৃহৎ; সুতরাং যখন সূর্য চন্দ্রের অন্তরালে আইসে, তখন অতিদূরবর্তী পৃথিবীর কেন্দ্রস্থিত দর্শকের নিকটে সূর্যগ্রহণ হইলেও পার্শ্ববর্তী স্থানের দর্শকগণ গ্রহণের কোনও উদ্দেশ পাইতে পারেন না; কারণ, ঐ স্থানবর্তী দর্শকের দৃষ্টিরেখা সূর্য ও চন্দ্রের কেন্দ্রভেদ করিয়া যায় না; এইজন্যই সূর্যগ্রহণে অক্ষাংশ ও ভুজাংশের লম্বন-গণনা (correction of parallax in latitude and longitude) আবশ্যক হইয়া পড়ে।

এই চান্দ্র ও সৌরগ্রহণের তথ্যসমূহ হিন্দুর চক্ষে এত পবিত্র বলিয়া মনে হইত যে, উহাদিগের প্রচার সম্বন্ধে "সূর্যসিদ্ধান্তে" একটা বিশেষ আদেশ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এমন কি, চীনদেশেও ঠিক এইরূপ ভীতি-ব্যঞ্জক পবিত্রতার সহিত গ্রহণসমূহ লক্ষিত হইত; তাই আমরা দেখিতে পাই, খ্রীস্টপূর্ব ২১৫৯ অব্দে রাজকীয় জ্যোতিষিদ্বয় হি এবং হো একটি গ্রহণের পূর্বসংবাদদানে অসমর্থ হওয়ায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কারণ তৎকালীন লোকসাধারণের বিশ্বাস, একটি সৌর বা চান্দ্র গ্রহণ তদ্দেশের শুভ বা অশুভ বার্তা সূচনা করিত। ইহা তেমন আশ্চর্যের কথা নয়। কারণ, নভোমণ্ডলের যে আলোকোজ্জ্বল সৌন্দর্য মানবের হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও ভক্তিপ্রবণতার উদ্রেক করিয়া দিয়া যাইত, তাহা একটা গ্রহণের দ্বারা ক্ষণকালের জন্যও লুপ্ত হইলে, মানবের মনে একটা খণ্ডপ্রলয় বা জলপ্লাবনের আশঙ্কা হইতে পারিত; সুতরাং, গ্রহণসমূহ একটা অদ্ভুত ভীতিব্যঞ্জক চিত্তবিকারের সহিত লক্ষিত হইত। এইজন্য যাঁহারা এই প্রাকৃতিক তথ্যসমূহের বিশদ বৃত্তান্ত নির্ধারণে সমর্থ ছিলেন, তাঁহারা সাধারণের নিকট অত্যধিক জ্ঞানী ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতেন। এইরূপে জ্যোতিষশাস্ত্রের অতি শৈশবে ফলিত-জ্যোতিষ জ্যোতিষশাস্ত্রের গণিত-বিভাগের সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছিল। হি ও হো-র প্রাণদণ্ড হইতে আমরা ইহাই অনুমান করিতে পারি যে, সেই সময়েও চীনদেশীয় জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্‌গণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে চান্দ্র ও সৌর গ্রহণ গণনা করিবার নিয়মাবলী অবগত ছিলেন।

এই গ্রহণ-গণনা সম্বন্ধে বেবিলনবাসী জ্যোতিষিগণের কৃতিত্বও কম প্রশংসনীয় নহে। গ্রীক সভ্যতা যখন ভবিষ্যতের অতল গর্ভে নিহিত ছিল, তখনই বেবিলনবাসী কেলডীয়ান ঋষিগণ চন্দ্র ও সূর্য-গ্রহণের পুনরাবর্তনের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাকে তাঁহারা

সেরস্ ( saros ) বা পুনরাবর্তন বলিতেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, দুই শত তেইশ চান্দ্র-মাসে অথবা আঠার বৎসর এগার দিনে চন্দ্রের কেতুদ্বয় পৃথিবীর চতুর্দিকে সম্পূর্ণরূপে আবর্তন শেষ করে। এই দুই শত তেইশ চান্দ্র-মাসকে তাঁহারা একটা কল্প বলিতেন, এবং ভূয়োদর্শনের ফলে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এইরূপ একটি কল্পে যেরূপ ভাবে গ্রহণ হইয়া থাকে, পরবর্তী কল্পেও ঠিক একই পদ্ধতি অনুসারে একই প্রকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সেইরূপ ভাবে গ্রহণসমূহের পুনরাবির্ভাব হইতে থাকিবে। ইহা সম্যক্ রূপে বুঝিতে হইলে, আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যখন সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্র ও চন্দ্রকক্ষের নীচবিন্দু ( node ) একই সরল রেখায় অবস্থিত হয়, তখনই গ্রহণ হইবে। এই গ্রহণের বিশেষত্বটি কেলডীয়ানদিগের প্রতি কল্পে সমান ভাবে পরিলক্ষিত হয় বলিয়াই পুনরাবর্তন নিয়মের উপযোগিতা। হইতে পারে কেলডীয়ান ঋষিগণ কোনও জ্যোতিষিক বেধালয়ে মানযন্ত্রের সাহায্যে এই বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার করেন নাই,— সম্ভবতঃ তাঁহারা ভূয়োদর্শনের ফলে এই সাধারণ নিয়মটি লিপিবদ্ধ করেন; কিন্তু এই সিদ্ধান্তে আসিবার পূর্বে তাঁহাদিগের বহুকালব্যাপী ভ্রমশূন্য গ্রহণ-গণনায় নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে নক্ষত্রপুঞ্জের তালিকা প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল, এবং সূর্য, চন্দ্র ও অপরাপর গ্রহগণের গতি-নির্ধারণের জন্য রাশিচক্রের দ্বাদশরাশির ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। সুতরাং এই পুনরাবর্তন ( saros ) কল্পের নির্ধারণ জ্যোতিষশাস্ত্রের উন্নতির পক্ষে অল্প প্রয়োজনীয় ছিল না।

এই গ্রহণ-গণনার আলোচনায় আমরা দেখিলাম যে, ইহাতে ক্রান্তিবৃত্ত (ecliptic) বা সূর্যকক্ষা ও রাশিচক্রের (zodiac) বিভাগের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। হিন্দুদিগের গণনা করিবার দুইটি ভিন্ন

পদ্ধতি ছিল,— একটি চান্দ্র তিথির দ্বারা, অপরটি রাশির সাহায্যে। অবশ্য প্রথমটি দ্বিতীয়টির বহুপূর্বে আবিষ্কৃত হয়। কারণ, তারকাপুঞ্জের মধ্যে চন্দ্রের দৈনিক অবস্থান বা গতি আমরা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারি; কিন্তু দৈনিক গতির দ্বারা নিয়মিত সূর্যের তারকাপুঞ্জের মধ্যে অবস্থিতি পরোক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করে, যেহেতু সূর্যের প্রখর আলোকে নিকটবর্তী তারকাপুঞ্জও দৃষ্টিপথে আসিতে পারে না। অথচ বিবিধ বাহ্য শক্তিপুঞ্জের আকর্ষণহেতু চন্দ্রের গতি সূর্যের গতির ন্যায় শৃঙ্খলাধীন নহে, এবং আমাদিগের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সহিত সূর্যের গতি-নির্ধারণ একেবারে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কারের জন্য রাশিচক্রের দ্বারা জ্যোতিষগণনা একান্ত অনিবার্য হইয়া পড়িল, এবং ক্রমে পূর্বোক্ত তিথিবিভাগ প্রাচীন পদ্ধতির মধ্যে পরিগণিত হইল। তিথিবিভাগের দ্বারা জ্যোতিষগণনার প্রচলন বহু প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই যে, হিন্দুদিগের সর্বপ্রথম তিথিবিভাগের অনুক্রমে কৃত্তিকা নক্ষত্র মহাবিষুববিন্দুর ( vernal equinox ) চিহ্নস্বরূপ রহিয়াছে। তাহাতে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, অন্ততঃ ২৩০০ বৎসর খ্রীস্টপূর্বে এরূপ বিভাগ সম্ভব হইতে পারিত। তাঁহারা আরও সিদ্ধান্ত করেন যে, ক্রান্তিবৃত্তের এইরূপ বিভাগ জ্যোতিষিগণের প্রাচীনতম চেষ্টা। সুতরাং আমাদিগের মনে হয়, যখন হিন্দুগণ একটি বিভাগের আবিষ্কর্তা, তখন সম্ভবতঃ ক্রমিক উন্নতির সাধারণ নিয়মানুসারে অপেক্ষাকৃত কার্যোপযোগী রাশিচক্রের বিভাগটিও হিন্দু জ্যোতির্বিদ্‌গণের গবেষণাপ্রসূত।

এই তিথিবিভাগ সম্বন্ধে এই স্থলে আর একটু আলোচনা করা আবশ্যক। তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব, চন্দ্রের দৈনিক গতির

সহিত তিথিবিভাগের কিরূপ সংযোগ আছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুরা ক্রান্তিবৃত্তের সন্ধান জানিতেন; তাঁহারা আরও জানিতেন যে, রাশিচক্রের সহিত চন্দ্রকক্ষার অবনতি (inclination of the moon's orbit to the ecliptic) অতি সামান্য— এত সামান্য যে চন্দ্রের দৈনিক গতির নির্ধারণকালে উহা গণনা না করিলেও চলিতে পারে। সুতরাং তাঁহারা চন্দ্রের দৈনিক গতি নির্দেশ করিবার জন্য ক্রান্তিবৃত্তকে প্রথমে ২৮শ ভাগে, পরে ২৭শ ভাগে বিভক্ত করেন; এবং প্রতি বিভাগ সূচিত করিবার নিমিত্ত এক-একটি তারকাপুঞ্জ স্থির করেন। তাঁহাদিগের শেষ বিভাগটিই অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত; কারণ, ইহাতে এক-একটি বিভাগের পরিমাণ চন্দ্রের দৈনিক গতির প্রায় সমান, এবং একটি নাক্ষত্রিক আবর্তনের সময় (mean sidereal revolution) অর্থাৎ চন্দ্রের গতি একটি তারকাপুঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রের সেই তারকাপুঞ্জে ফিরিয়া আসিতে ২৭⅓ দিন যাপিত হয়, এবং ভগ্নাংশ বাদ দিলে ২৮ দিন না ধরিয়া ২৭ দিন ধরাই বিধেয়। এই ২৭টি চান্দ্রবিভাগ সূচিত করিবার জন্য হিন্দুরা ২৭টি তারকাপুঞ্জ স্থির করিয়াছিলেন। প্রতি পুঞ্জের উজ্জ্বলতম তারকাটিকে তাঁহারা যোগতারা বলিতেন এবং সমগ্র পুঞ্জটিকে নক্ষত্র বলিতেন। ঐ যোগতারা প্রতি বিভাগের আদিপ্রান্ত সূচিত করিত। এইরূপে প্রত্যেক বিভাগ বিভাগীয় নক্ষত্রের ন্যায় নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিত, এবং সেই নির্দিষ্ট বিভাগগুলির সাহায্যে চন্দ্রের দৈনিক গতি স্থিরীকৃত হইত। স্থানান্তরে প্রকাশিত চিত্রে যোগতারার সহিত ক্রান্তিবৃত্তের ২৭টি বিভাগ প্রদর্শিত হইল।

কিন্তু আমরা দেখিলাম যে, তিথি-গণনায় ক্রান্তিবৃত্তের এই ২৭টি বিভাগ বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও, চন্দ্রের দৈনিক গতির একটা শৃঙ্খলা

নাই বলিয়া, জ্যোতিষগণনা-কালে উহার তত উপযোগিতা নাই। সুতরাং রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশিতে বিভাগ আবশ্যক হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্ত্য দেশের অনেকের ধারণা, এই রাশিচক্রের বিভাগ গ্রীস্‌দেশে জন্মলাভ করিয়া অন্যান্য প্রাচীন সভ্য দেশসমূহে প্রচারিত হইয়াছিল। এ ধারণা আমরা একেবারেই বিজ্ঞানসম্মত মনে করি না। অবশ্য সাধারণতঃ সকল দেশের লোকেরই হৃদয়ে স্বজাতির বা প্রতিবেশীজাতির গৌরব-বর্ধনের প্রবল ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায়; কোনও একটা প্রসিদ্ধ কীর্তি আপন দেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা স্বাভাবিক। তথাপি একটা মাত্রা থাকা আবশ্যক। পাশ্চাত্ত্য লেখকগণ প্রাচীন জ্যোতিষের আলোচনা কালে হিন্দু জ্যোতিষের উল্লেখ দেখিলে, অধিকাংশস্থলে একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া, ভারতবাসীর প্রাপ্য প্রশংসাটুকু আপনাদিগের বা প্রতিবেশী অপর ইওরোপীয় জাতির জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখেন। আবার যাঁহারা প্রাচীন জ্যোতিষের ক্রমিক উন্নতির ধারায় একটা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করিতে অগ্রসর হন তাঁহাদিগের কেহই বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ নহেন, যদিও তাঁহারা শ্রমপরায়ণ ঐতিহাসিক সন্দেহ নাই। এইজন্য তাঁহারা জ্যোতিষিক ঘটনাবলীর ঠিকমত পর্যালোচনা করিয়া সময় নির্দেশ করিতে এবং দেশবিশেষকে আবিষ্কারের প্রাপ্য কৃতিত্বটুকু দিয়া উঠিতে পারেন না। ইহা কিন্তু অল্প ক্ষোভের বিষয় নহে।

যাহা হউক, আমরা এক্ষণে ঐ বিষয়ের যথাযথ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। আমরা পূর্বেই অনুমানের উপর বলিয়াছি যে, সম্ভবতঃ হিন্দু জ্যোতির্বিদ্‌গণ রাশিচক্রের বিভাগটি (twelve signs of the zodiac) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এক্ষণে জ্যোতিষিক ঘটনাসমূহের বিচারের

দ্বারা দেখা যাউক, উহা কতটা প্রমাণসঙ্গত। বায়ট্ ( Biot ) সাহেব বলেন যে, প্রথমে চীন জ্যোতিষিগণ সিউ ( sieu ) নাম দিয়া ক্রান্তিবৃত্তের বিভাগ বাহির করেন। পরে ইহা হইতে হিন্দুদিগের নক্ষত্র ও আরব-দিগের মঞ্জিল উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু অধ্যাপক ওয়েবার ( Weber ) সাহেব সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, চীনবাসিদিগের সিউ ও আরবদিগের মঞ্জিল হিন্দুজ্যোতিষের পরবর্তী কালের বিভাগ হইতে গৃহীত। এই বিভাগে উপনীত হইবার পূর্বে হিন্দু জ্যোতিষকে বিবিধ স্তর পার হইয়া আসিতে হইয়াছে। ইহাতে তিনি বলেন যে, চন্দ্রের গতি-নির্ণয়ের জন্য তিথি-বিভাগ হিন্দুর গবেষণাসম্ভূত; এবং পরে আরববাসীরা উহার অনুকরণে আপনাদিগের মঞ্জিল বাহির করিয়াছেন। কিন্তু এই স্থলেই আবার অধ্যাপক ওয়েবার বলেন যে, বেবিলন দেশের জ্যোতির্বিদ্‌গণ প্রথমে এই বিভাগ-প্রণালীর আবিষ্কার করেন। এই সিদ্ধান্তটি ঠিক বিজ্ঞানসম্মত নহে; কারণ, পাশ্চাত্ত্য গণিতজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন যে, বেবিলন দেশের বিভাগ-প্রণালীটি সূর্যের দৈনিক গতির সহিত সম্বদ্ধ। কিন্তু আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, হিন্দুদিগের প্রথম বিভাগটি চন্দ্রের দৈনিক গতির উপর নির্ভর করে; এবং ইহাও বলিয়াছি যে, পাশ্চাত্ত্য গণিতজ্ঞগণ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, চান্দ্র বিভাগটি প্রথমে আবিষ্কৃত হয়, এবং পরে ক্রমিক উন্নতির সাধারণ নিয়মানুসারে রাশিচক্রের দ্বাদশরাশিতে বিভাগ প্রচলিত হয়। তাই আমাদিগের মনে হয়, যে-দেশে মূল ভিত্তিটি নিহিত ছিল, সেই দেশেই ঐ ভিত্তির উপর বনিয়াদও প্রস্তুত হওয়া সর্বাপেক্ষা সম্ভবপর। সুতরাং ইহা প্রায় নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, বেবিলনবাসীদিগের বিভাগ-প্রণালী হিন্দুদিগের বিভাগ-প্রণালীর নিকট ঋণী।

কিন্তু বিবিধ বৈজ্ঞানিক প্রমাণসমূহের আলোচনা করিলে আমাদিগের

মনে হয়, হিন্দু-জ্যোতিষ, চীন-জ্যোতিষ, ও বেবিলন-জ্যোতিষ পাশাপাশি ভাবে থাকিয়া পরস্পরের সাহায্যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল। এই স্থলে ইহাও বলিতে পারি যে, কোলব্রুক সাহেব ঐ সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত দেশসমূহের জ্যোতিষশাস্ত্র একই মূল হইতে সংগৃহীত। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পক্ষে তিনি বেশ যুক্তিযুক্ত কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, হিন্দু, চীন ও বেবিলিয়ান সকলেই সপ্তাহকে সাত দিনে বিভক্ত করিয়াছেন, দিনগুলির নামেও বেশ সাদৃশ্য আছে। তাঁহাদিগের রবিকক্ষার বিভাগটি একরূপ, রাশিচক্রেরও দ্বাদশরাশিতে বিভাগ সকলেরই এক প্রকার। বৎসরের মাস-সংখ্যাও একরূপ। এবং সর্বশেষে তাঁহাদিগের নক্ষত্রমণ্ডলীর সংখ্যাও যেরূপ এক, সেইরূপ উহাদের কল্পনাপ্রসূত নামকরণেও বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।

কেহ-কেহ আবার গ্রীক জ্যোতিষও উক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেন ; কিন্তু কয়েকটি বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করিলে আমাদের মনে হয়, গ্রীক জ্যোতিষ হিন্দু ও বেবিলিয়ান জ্যোতিষের সহিত এক সময়ে গড়িয়া উঠে নাই। কারণ, আমরা দেখিতে পাই, সর্বপ্রথমে থেল্‌স্ ( Thales )-ই গ্রীসদেশে জ্যোতিষচর্চার স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেন, এবং এই থেল্‌স্ মিশর দেশীয় পুরোহিতগণের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। ইহার পূর্বে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জ্যোতিষের আলোচনা গ্রীসদেশে হয় নাই ; ইহার বহু কাল পরেও তেমন বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণের দ্বারা জ্যোতিষের চর্চা ঐ দেশে হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এমন কি, এরিস্টটলের ( Aristotle ) সময়েও গ্রীসদেশে তেমন বৈজ্ঞানিক নিয়মে জ্যোতিবিক প্রমাণের বিচারপদ্ধতি প্রচলিত হয় নাই। পৃথিবীর পরিধি যে গোলকাকার, ইহার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া এরিস্টটল বলিতেছেন,

গোলকই সর্বাপেক্ষা সুগঠিত ও সুশৃঙ্খল আকৃতি, এবং সেই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি-কুশলীর নির্মাণে সুগঠন ও শৃঙ্খলাই স্বাভাবিক; সেইজন্য পৃথিবীর পরিধি গোলকাকার। আর-এক স্থলে সূর্যের দৈনিক গতির প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন, পূর্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখী গতিই সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক, সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রহ সূর্যদেব অবশ্যই ঐ গতি অবলম্বন করিবেন। ইহা দার্শনিক বিচার হইতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহার স্থান বড় নয়। গ্রীসদেশের প্রধান জ্যোতির্বিদ হিপার্কাস ও টলেমি। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারাই গ্রীকজ্যোতিষের সংস্কার করিয়া উহার পুনর্গঠন করেন। খ্রীস্টপূর্ব প্রায় দেড়শত বর্ষ পূর্বে হিপার্কাস স্থির করেন, সূর্যের এক ক্রান্তিপাত হইতে পুনরায় সেই ক্রান্তিপাতে (নক্ষত্রের সহিত তুলনা করিলে) আসিতে পূর্ববৎসর অপেক্ষা পরবৎসর অল্প সময় ব্যয়িত হইবে। ক্রান্তিপাতে এই অগ্রে উপস্থিতিকে অয়ন (precession) কহে। এই অয়নের নিমিত্ত দুই প্রকার বৎসর গণনা হয়,— এক সায়ন বর্ষ (tropical year), অর্থাৎ এক ক্রান্তিপাত হইতে পুনরায় সেই ক্রান্তিপাতে আসিতে সূর্যের যে সময় ব্যয়িত হয়; আর-একটি নাক্ষত্রিক বৎসর (sidereal year), অর্থাৎ এক নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় সে নক্ষত্রে প্রত্যাগমন করিতে সূর্যের যে সময় অতিবাহিত হয়। হিপার্কাস উভয়বিধ বৎসরের পরিমাণ, প্রতি মাসের দিবস-সংখ্যা ও সূর্যাদি পঞ্চ গ্রহের আবর্তন-কাল ও গতি নির্ধারণ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নিরক্ষবৃত্তের সহিত সূর্যকক্ষা ও চন্দ্রকক্ষার অবনতি (inclination of the solar and lunar orbits with the equator) স্থির করেন, এবং বিশেষ পারদর্শিতার সহিত নির্ভুলভাবেই এই সমুদায় নির্দেশ করেন। অবশ্য এই সকল সিদ্ধান্তের জন্য অনেকস্থলে তিনি কেলডীয়ান্ ঋষিগণের গবেষণার সাহায্য লইয়াছিলেন; কিন্তু তাহা হইলেও, তিনিই

প্রথম গ্রীসদেশে জ্যোতিষশাস্ত্রকে গণিতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার প্রায় চারিশত বৎসর পরে টলেমির আবির্ভাব হয়। এই সময়ের মধ্যে গ্রীসদেশে জ্যোতিষশাস্ত্রের তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনা হয় নাই; এবং হিপার্কাসের পর টলেমিও যে বড় বেশী কিছু নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব— পূর্ববর্তী জ্যোতির্বিদ্‌গণের আবিষ্কারসমূহ সুশৃঙ্খল ও সুসংলগ্ন ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করা। কিন্তু সাধারণ লোক-মতের উপর হিপার্কাস অপেক্ষা টলেমির প্রভাব অধিক ছিল। তিনিই সর্বপ্রথম প্রচার করেন,— পৃথিবী নিশ্চল, সৌরমণ্ডলের গ্রহগণ পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। অবশ্য ইহা সাধারণ অভিজ্ঞতার দিক দিয়া খুবই সম্ভবপর বলিয়া মনে হইত। এই প্রসঙ্গে টলেমির বিচারপদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত না হইলেও বেশ আমোদজনক। টলেমি বলেন, গ্রহতারকা আগ্নেয় প্রকৃতিবিশিষ্ট, আর পৃথিবী কঠিন পদার্থের সমষ্টি; সুতরাং পৃথিবী অপেক্ষা গ্রহতারকারই একটা গতি থাকা অধিক সম্ভবপর; এবং ইহাও অনুমান করা স্বাভাবিক যে, পৃথিবীর যদি একটা গতি থাকিত তাহা হইলে আমরা তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতটা অনভিজ্ঞ হইব কেন? ইহা সাধারণ জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু বিজ্ঞানে বড় উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে নাই।

এই সময়ে প্রাচ্য মনীষার মহিমায় ভারতে বেশ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে জ্যোতিষশাস্ত্রের দ্রুত উন্নতি হইতেছিল। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে আর্যভট স্থির করিয়াছিলেন যে, নিজকক্ষায় আপনার ব্যাসের চতুর্দিকে পৃথিবীর একটি দৈনিক গতি আছে, এবং সূর্যের চারিধারে ইহার একটি বার্ষিক গতি আছে। তিনি আরও বলেন, তারকামণ্ডলী নিশ্চল; পৃথিবীর আবর্তনের দ্বারা তারকাগণ ও গ্রহসমূহের আবির্ভাব ও তিরোধান

সাধিত হয়। আর্যভট বলেন, প্রবহবায়ু কর্তৃক পরিচালিত হইয়া পৃথিবীর এইরূপ আবর্তন হইয়া থাকে। এই-সকল তথ্য হইতে ইহাই অনুমান করা সঙ্গত যে, গ্রীসদেশে জ্যোতিষচর্চার বহুকাল পূর্বে ভারতের হিন্দুগণ জ্যোতিষজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। টলেমির পর গ্রীসদেশে জ্যোতিষের আলোচনা একপ্রকার লোপ পাইয়া যায়; এবং আরববাসিগণ ইওরোপে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিতে যাইয়া সেই জ্ঞানের ধারা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও মৌলিক গবেষণা তেমন আবিষ্কৃত হয় নাই, সাধারণ অনুবাদের উপর দিয়াই সে ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল। কেবল আলবাতানি ও আবুল ওয়াফা অয়নাংশবিভাগ ( precession ) ও চন্দ্রকক্ষার সম্বন্ধে কিছু নূতন তথ্য প্রচার করিয়াছিলেন মাত্র। এই সমস্ত আলোচনা আমাদের পূর্ব মীমাংসার অনুকূল বলিয়াই মনে করি; হিন্দু, চীন ও বেবিলিয়ন জ্যোতিষই সর্বপ্রথমে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়; আর তাহার কিছুকাল পরে ইহাদের প্রভাবে আসিয়া গ্রীসবাসী ও আরববাসীরা জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন।

যাহা হউক, এক্ষণে আমরা পুনরায় আমাদিগের পূর্বোল্লিখিত রাশি-চক্রের আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করিব। আধুনিক যুগে আমরা আমাদিগের সুপ্রতিষ্ঠিত বেধালয় ও সুগঠিত মানযন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের অথবা অন্য কোনও জ্যোতিষ্কের দৈনিক অবস্থিতি নির্ধারণ করিতে সমর্থ হই; কিন্তু প্রাচীন কালের জ্যোতিষ-আলোচনাকারীদিগের এই সুবিধার কণামাত্রও ছিল না। আমরা সূর্যসিদ্ধান্তের দ্বাদশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই যে, অতি পূর্বেই হিন্দুরা নির্দেশ করিয়াছিলেন, বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জ একটি অদৃশ্য শৃঙ্খলের দ্বারা পরস্পর সংবদ্ধ হইয়া নভোমণ্ডলে যেন দৃঢ়সংলগ্ন রহিয়াছে; এবং ঐ সমগ্র নভোমণ্ডলটি ব্যোমস্থ একটি নির্দিষ্ট অক্ষের ( axis ) চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাঁহারা আরও লক্ষ্য করিয়াছিলেন,

ব্যোমমণ্ডলের সমগ্র স্থান অধিকার করিয়া বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, এবং এই ব্যোমের মধ্য দিয়া সূর্য, চন্দ্র ও অপরাপর গ্রহগুলি স্ব-স্ব মার্গে গমন করিতেছে। সুতরাং এই নক্ষত্রপুঞ্জ সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতির দৈনিক গতি ও অবস্থিতির নির্দেশক হইয়া দাঁড়াইল। এই রাশিচক্রের বিভাগ ও গঠন আর একটু বিশদ করিয়া বুঝাইতে হইলে বলিতে হয়, আমরা যদি মনে করি ব্যোমমণ্ডলে একটি বৃহৎ ঘড়ি লম্বিত আছে, সাধারণ ঘড়ির ন্যায় উহাতেও দ্বাদশটি বিভাগসূচক দ্বাদশটি অঙ্ক রহিয়াছে, আর মধ্যস্থলে সময়-নির্দেশক একটি বড় কাঁটা সংলগ্ন আছে,— তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, রাশিচক্রের সহিত এইরূপ ঘড়ির খুবই সাদৃশ্য রহিয়াছে। এইরূপ ঘড়ির দিকে চাহিলেই যেমন আমরা ঠিক সময়টি জানিতে পারি, সেইরূপ ঐ রাশিচক্রের একটু পর্যবেক্ষণ করিলেই কোনও বিশেষ সময়ে সূর্যের অবস্থিতি অবগত হইতে পারি। তাই আমরা বলিতেছিলাম, যে-কেহ এই রাশিচক্রের প্রবর্তক হউক না কেন, ইহা যে প্রাচীন জ্যোতিষের একটা উচ্চাঙ্গের কৃতিত্ব, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আমরা দেখিলাম, ব্যোমপথে রবিমার্গটি বৃত্তাকার। ঐ রবিমার্গকে যদি দ্বাদশভাগে বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, এক-একটি বিভাগ এক-একটি নক্ষত্রপুঞ্জের দ্বারা অধিকৃত রহিয়াছে, ইহাকেই রাশিচক্রের বিভাগ কহে। যে-কোন সময় হইতে আরম্ভ করিলে (সাধারণতঃ বিষুববিন্দুতে সূর্যের অবস্থিতির সময় হইতে আরম্ভ করা হয়) দেখিতে পাই, এক-একটি বিভাগ অতিক্রম করিতে সূর্যের প্রায় একমাস ব্যয়িত হয়; এবং এই কারণে যে-কোনও সময়ে সূর্যের গতি নির্দেশ করিবার একটি উপায় হইবে,— যে-বিভাগে সূর্য আছে সেই বিভাগটির নাম করা এবং সেই বিভাগের কোন্ স্থলে আছে তাহা স্থির করা।

আবার ব্যোমপথে চন্দ্রমার্গও বৃত্তাকার, উহাকে আমরা ২৭টি তিথিতে বিভক্ত করিয়াছি। ইহার বিষয়ে পূর্বেই আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আরও আমরা দেখি, সূর্য চন্দ্র ও অপরাপর গ্রহগণের গতি রবিমার্গের চতুর্দিকে একটি ক্ষুদ্র বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ বলিয়া ঐ রাশিচক্রের বিভাগের অধিকতর উপযোগিতা। সূর্যসিদ্ধান্তে ঠিক এই ভাবেই চান্দ্রমাস ও সৌরমাস নির্ণীত হইয়াছে—

ঐন্দবস্তিথিভিস্তদ্বৎসংক্রান্ত্যা সৌর উচ্যতে।
মাসৈর্দ্বাদশভির্বর্ষং দিব্যং তদহরুচ্যতে॥ ১।১৩

ত্রিশ চান্দ্র দিনে (তিথিতে) এক চান্দ্রমাস হয়। সূর্যের এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে সংক্রমণকাল এক সৌরমাস। দ্বাদশ সৌর মাসে এক বৎসর; তাহাই দেবতাগণের এক দিন-রাত্রি।

এইরূপে যখন সূর্য ও চন্দ্রের গতি সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত হইয়া উহাদের দৈনিক অবস্থিতি নির্দেশ করা সহজসাধ্য হইয়া পড়িল, তখন জ্যোতিষশাস্ত্রের ক্রমোন্নতির দ্বিতীয় স্তরে গ্রহণ-গণনার প্রবর্তন হইল। এই গ্রহণ-গণনা প্রাচীন প্রায় সকল দেশের জ্যোতির্বিদ্‌গণ বেশ সূক্ষ্ম ও নির্ভুলরূপে করিতে পারিয়াছিলেন। অবশ্য আধুনিক যুগের মত এতটা নিখুঁত হয় নাই, কারণ প্রধানতঃ গ্রহণ-গণনার সহিত পৃথিবীর গতির বেশী যোগাযোগ নাই; পৃথিবী নিশ্চল এবং সূর্য ইহাকে কেন্দ্র করিয়া পরিক্রমণ করিতেছে, এরূপ করিলেও একই গণনা হইবে। গ্রহণ-গণনার ফলাফল চন্দ্রের ও চন্দ্রকক্ষার নীচবিন্দুর (node) অবস্থিতি অনুসারে পৃথিবীর দ্বারা প্রতিফলিত কৌণিক ছায়ার (cone of shadow) গতির উপর নির্ভর করে; এবং সূর্য স্থির থাকিলে এবং পৃথিবী ভ্রমণশীল

হইলে এই ভূচ্ছায়ার গতি যাহা হইবে, উহার বিপরীত হইলেও ঠিক তাহাই হইবে। সূর্য সিদ্ধান্তে ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

ভানোর্ভার্ধে মহীচ্ছায়া তত্তুল্যেঽর্ক সমেঽপি বা।
শশাঙ্কপাতে গ্রহণং কিয়দ্ভাগাধিকোশকে ॥ ৬।৪।
তুল্যৌ রাশ্যাদিভিঃ স্যাতামমাবস্যান্ত কালিকৌ।
সূর্যেন্দু পৌর্ণমাস্যন্তে ভার্ধে ভাগাদিকৌ সমৌ ॥ ৭।৪।

অর্থাৎ পৃথিবীর ছায়া সূর্য হইতে সদা ছয় রাশি অন্তরে থাকে। চন্দ্রপাত ( node of the moon's orbit ) ছায়া কিংবা রবির সমান রাশিতে স্থিত হইলে গ্রহণ ঘটিবে ; অথবা ছায়া বা রবির রাশির অংশ হইতে কিঞ্চিৎ অল্প বা অধিক হইলেও গ্রহণ হইবে। অমাবস্যার অন্তিমকালে রবির রাশির অংশ চন্দ্রের রাশির অংশের সমান। পূর্ণিমার অন্তে চন্দ্র ও সূর্যের রাশির অংশে ছয় রাশির পার্থক্য। এইজন্য অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় গ্রহণ হইয়া থাকে।

এইরূপে রাশিচক্রে সূর্য ও চন্দ্রের গতি নির্ধারণ করিবার সময়ে প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্গণের সম্মুখে একটা নূতন তথ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন, এক বৎসর সূর্য যখন বিষুববিন্দু হইতে পরিক্রমণ আরম্ভ করিলেন, তখন যে তারকা সেই বিন্দুতে লক্ষিত হইতেছিল, বৎসরান্তে সূর্য পুনরায় সেই বিষুববিন্দুতে প্রত্যাবর্তন করিলে পূর্বোক্ত তারকাটি আর সেই বিন্দুতে রহিবে না ; অধিকন্তু, বিভাগীয় তারকাগুলি ঐ বিন্দুর একটু পশ্চাতে সরিয়া আসিবে ; এবং উহাদের গতি তারকা-পুঞ্জের মধ্যে সূর্যের বার্ষিক গতির ঠিক বিপরীত দিকে হইবে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, গ্রীসদেশে খ্রীস্টের প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে হিপার্কাস এই অয়নাংশভাগের ( precession ) আবিষ্কার করেন। কিন্তু ইহা

হিন্দু জ্যোতির্বিদ্‌গণের নিকট একেবারেই নূতন তথ্য ছিল না ; তাঁহারা ইহার বহুকাল পূর্বে এই তথ্যের উদ্ভাবনা করেন।

এই অয়নাংশ-গণনা জ্যোতিষশাস্ত্রে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে ; কারণ জ্যোতিষশাস্ত্রীয় পর্যবেক্ষণসমূহ উহাদের বিশুদ্ধি ও নির্ভুলতার জন্য বহু পরিমাণে অয়নাংশ-গণনার উপর নির্ভর করে। এতদ্‌ব্যতীত ইহার প্রয়োজনীয়তা ও আলোচনার আর একটি কারণ আছে। ইহার সাহায্যে আমরা প্রাচীন জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণগুলির কাল নির্ণয় করিতে পারি এবং তৎকালীন জ্যোতির্জ্ঞান পরীক্ষা করিয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর সময় নির্ধারণ করিবার পক্ষেও অনেকটা সহায়তা পাইয়া থাকি। সুতরাং জ্যোতিষশাস্ত্রের ক্রমিক ধারার নির্দেশ করিতে হইলে অয়নাংশ-গণনার বিশদ আলোচনা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ; বরং কতকটা সুসঙ্গত হইবে।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, সূর্যের গতিমার্গ বৃত্তাকার এবং ব্যোমমণ্ডলে ইহার তলভাগ ( plane ) নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। সুতরাং ব্যোমের কেন্দ্র ভেদ করিয়া রবিকক্ষার উপর যে লম্ব ( perpendicular) অবস্থিত, উহাও নিশ্চল। পৃথিবীর অক্ষ ( axis ) এই লম্বরেখার চারিধারে আবর্তিত হয়। ২৬,০০০ বৎসরে একটি আবর্তন সমাপ্ত হয়। এই দোলনের গণনাকে অয়নাংশ কহে। এই দোলনের জন্য ধ্রুবাক্ষ ( polar axis ) ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া যায়। এই বিন্দুগুলি ক্রমে ব্যোমে একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত গঠিত করে ; এবং ইহার ফলে এই বৃত্তের দ্বারা চিহ্নিত পথে যে তারকাগুলি অবস্থান করে, উহারাই একটির পর একটি ধ্রুবনক্ষত্র আখ্যা পাইয়া থাকে। এইরূপে যখন দোলনের ব্যাপার চলিতে থাকে, তখন নিরক্ষবৃত্ত (equator) ও ক্রান্তিবৃত্তের ( ecliptic ) পরস্পর ছেদক রেখা, যাহা বিষুববিন্দুতে অবস্থান কালে

সূর্যের কেন্দ্র ভেদ করিয়া যায়, তাহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রের সূচনা করিবে। ইহাই আর একটু সরল করিয়া বলিতে হইলে আমরা বলি, ভিন্ন ভিন্ন আবর্তনে সূর্য বিষুববিন্দুতে বিভিন্ন নক্ষত্রের সূচনা করিবেন। এইভাবে নক্ষত্রের স্থানচ্যুতিকে আমরা নক্ষত্রপুঞ্জের দোলন ( libration ) বলি, এবং ধ্রুবাক্ষকে (polar axis) দোলনের আলম্ব (fulcrum) আখ্যা দিয়া থাকি। সূর্যসিদ্ধান্তের তৃতীয় অধ্যায়ে ইহার বিশেষ আলোচনা দেখিতে পাই :

ত্রিংশৎ কৃত্যো যুগে ভানাং চক্রং প্রাক্ পরিলম্বতে।
তদ্‌গুণাদ্ ভূদিনৈর্ভক্তাৎ দ্যুগণাদ্ যদাবাপ্যতে ॥ ৩।৯
তদ্দোস্ত্রিঘ্নাদশাপ্তাংশাঃ বিজ্ঞেয়া অয়নাবিধাঃ।
তৎসংস্কৃতাদ্ গ্রহাৎ ক্রান্তিচ্ছায়া চরদলাদিকম্ ।
স্ফুটং দৃক্‌তুল্যতাং গচ্ছেদয়নে বিষুবদ্বয়ে ॥ ৩।১০
প্রাক্‌চক্রং চলিতং হীনে ছায়ার্কাৎ করণাগতে
অন্তরাংশৈরথাবৃত্য পশ্চাচ্ছেষৈস্তথাধিকে ॥ ৩।১১

অর্থাৎ বিষুববিন্দুদ্বয়ে ( equinoxes ) ও অয়নান্ত বিন্দুতে ( solstitial points ) যখন সূর্য থাকেন, তখন সূর্যকে নিরীক্ষণ করিলে এই নক্ষত্রপুঞ্জের দোলন বা অয়নাংশের গতি দৃষ্টিগোচর হয়। গণনা দ্বারা প্রাপ্ত সূর্যের স্পষ্ট স্থান ছায়াগত ( অর্থাৎ স্পষ্ট ) অর্কস্থান ( সূর্যের ভুজাংশ, "longitude" ) হইতে যত অংশ ন্যূন হয়, নক্ষত্রপুঞ্জ তত অংশ পূর্বদিকে এবং যত অংশ অধিক হয়, তত অংশ পশ্চিমদিকে স্থিত হইবে।

এই যে পৃথিবীর গতি, যাহা হইতে অয়নাংশভাগের উৎপত্তি, ইহা আমাদিগের সাধারণ অভিজ্ঞতার সহিত তুলনা করিয়া বুঝিতে হইলে আমরা দেখি, যদি একটি লাটিমকে আমরা ভূমিতে ঘুরাইয়া দিই, তাহা

হইলে লাটিমটি ঠিক সোজাসুজিভাবে আবর্তিত হয় না; যে অক্ষের ( axis ) চতুর্দিকে উহা ঘুরিতে থাকে, তাহা একটি উর্ধ্বাধঃলম্বমান রেখার ( vertical axis ) উপর কিছু অবনত ( inclined ); লাটিমের অক্ষটি পৃথিবীর অক্ষের স্বরূপ এবং উর্ধ্বাধঃলম্বমান রেখাটি রবিমার্গ বা ক্রান্তিবৃত্তের অক্ষের নির্দেশক; আর এই আবর্তন পৃথিবীর গতি সূচিত করে। পৃথিবীর এই গতি হইতে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দৈনিক গতির উৎপত্তি। আমরা এখানে ইহাও বলিয়া রাখিতে পারি যে, এইস্থলে লাটিমের গতিবিজ্ঞান ( dynamics of its motion ) আর পৃথিবীর গতিবিজ্ঞান একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই অয়নাংশের দরুন পঞ্জিকা-গণনায় বড় গোলযোগ উপস্থিত হয়; কারণ, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, অয়নাংশের জন্য বৎসরের পরিমাণ দুইরূপ হয়,—একটি সায়ন বর্ষ (tropical year), আর-একটি নাক্ষত্রিক বর্ষ ( sidereal year )। ইহা ব্যতীত চান্দ্রদ্যুতিমাসের ( synodic month ) সাহায্যেও বৎসর গণনা করা যাইতে পারে। এই সময়-গণনা সম্বন্ধে কিরূপ বৈষম্য হইতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্য আমরা সূর্যসিদ্ধান্তের প্রথম অধ্যায় হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম :

পশ্চাদ্‌ব্রজন্তোঽতিবান্ নক্ষত্রৈঃ সততং গ্রহাঃ।
জীয়মানাস্তু লম্বন্তে তুল্যমেব স্বমার্গগাঃ। ১।২৫
প্রাগ্‌ গতিত্বমতস্তেষাং ভগণৈঃ প্রত্যহং গতিঃ।
পরিণাহবশাদ্‌ভিন্না তদ্‌বশাদ্ ভানি ভুঞ্জতে। ১।২৬
শীঘ্রগস্তান্যথাল্পেন কালেন মহতাল্পগঃ।
তেষাং তু পরিবর্তেন পৌষ্ণান্তে ভগণঃ স্মৃতঃ। ১।২৭

অর্থাৎ গ্রহগণ প্রবহবায়ু কর্তৃক পরিচালিত হইয়া নিজ-নিজ কক্ষোপরি নক্ষত্রসকলের সহিত পূর্বদিক হইতে পশ্চিমাভিমুখে নিরন্তর তুল্যবেগে

গমনকালে গতি বিষয়ে নক্ষত্রগণের নিকট পরাজিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ নক্ষত্রগণের পশ্চিমবাহিনীগতি গ্রহগতি হইতে অধিক। এইজন্য গ্রহসকলকে পূর্বদিকে অপসৃত হইতে দেখা যায়। গ্রহদিগের কক্ষার ন্যূনাধিক্যবশতঃ তাহাদিগের প্রাত্যহিক গতি সমান নহে। ভগণ দ্বারা ত্রৈরাশিক করিলেই ঐ গতির ন্যূনাধিক্য জানা যাইবে। শীঘ্রগামী গ্রহগণ অল্প সময়ে ও মন্দগামী গ্রহগণ অধিক সময়ে স্বীয় কক্ষাতে একবার পরিভ্রমণ করে; এইরূপ অসমান গতিতেই গ্রহগণ রাশির চক্র ভোগ করিয়া থাকে। গ্রহগণের এই পরিভ্রমণের নাম ভগণ; অর্থাৎ একটি নক্ষত্রের শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া পুনর্বার সেই নক্ষত্রের শেষ পর্যন্ত একবার ভ্রমণে এক ভগণ হয়।

সুতরাং দেখিতে পাই, ভগণ বা সময়ের পরিমাণ বহুবিধ। ইহার উপরে পর্যবেক্ষণ দ্বারা পরিমাণ ঠিক করাও বড় কষ্টসাধ্য। ইহা ব্যতীত কোনও পরিমাণই ভগ্নাংশ-বিরহিত নহে। অথচ আমরা দেখিতে পাই, ভারতে প্রচলিত শকাব্দ ও গ্রীসদেশে প্রচলিত জুলিয়াস সিজার-প্রবর্তিত এবং পরে পোপ গ্রীগরী কর্তৃক সংশোধিত অব্দ কতটা শুদ্ধ গণনার উপর প্রতিষ্ঠিত। এইজন্যই আমরা বিস্ময় মানি যে, অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে, চীনদেশে, মিশরে ও গ্রীসে কেমন করিয়া এতটা নির্ভুল ও সূক্ষ্মগণনাসমন্বিত পঞ্জিকা হইয়াছিল! এই কৃতিত্বের যথাযথ তথ্য নির্দেশ করা বহু আয়াসসাধ্য। ইহা আরও কঠিন হইয়া উঠে যখন আমরা দেখি, বিদেশীয়গণ প্রাচীন সভ্যদেশসমূহের বিজ্ঞানাদির আলোচনা কালে জাতিগত পার্থক্য স্মরণ করিয়া একেবারেই সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন না।

এই গ্রন্থ রচনাকালে ঐ বিষয়টিই আমার অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। পাশ্চাত্য লেখকগণ জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া হিন্দু

জ্যোতিষের উল্লেখ দেখিলে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া তাহাকে মোটেই আমল দেন না। যদিই বা দেন, তাহাও অধিকাংশ স্থলে এরূপ বিশেষণ-ভূষিত যে, আত্মসম্মান লইয়া তাহা পাঠ করা ভারতবাসীর পক্ষে একরূপ অসম্ভব। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতাধ্যাপক বেরী (Berry) সাহেব তাঁহার "জ্যোতিষশাস্ত্রের ইতিহাস" শীর্ষক পুস্তকে হিন্দু জ্যোতিষের কথা উঠিলে বলিতেছেন : হিন্দু জ্যোতিষ বিজ্ঞান হিসাবে বড় বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। যাহাও দুই-একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে, তাহা ভুলভ্রান্তিতে পূর্ণ, এবং গ্রীকদিগের নিকট হইতে না বুঝিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। তাই তিনি হিন্দু জ্যোতিষের আলোচনা করেন নাই। বেণ্টলী (Bentley) সাহেব আবার আর একটু চরমে উঠিয়াছেন। তিনি বলেন : "সাহিত্যে জালিয়াতি (forgeries) ভারতে এতটা প্রচলিত হইয়াছিল যে, কোন্ পুস্তকখানি ভারতে কৃত্রিম, কোন্‌খানি বা জাল, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না।......সাহিত্যে যে-কোনও ভয়ানক জুয়াচুরি করিয়া (flagrant literary impositions) তাহারা ধরা পড়ুক না কেন, মানুষের এমন কোনও বাধ্যতামূলক বিধিবিধান নাই, যাহার কবলে পড়িবার ভয় তাহাদের আছে; ধর্মের বা বিবেকের এমন কোনও শক্তি নাই, যাহা তাহাদিগকে এ পাপ হইতে রক্ষা করিতে পারে; বিশেষ দণ্ডের অধীন হইবারও এমন কোনও ভয় নাই, যাহা তাহাদিগকে এইরূপ কর্ম হইতে বিরত করিবে।" অত বড় বৃহৎ যে Encyclopædia Britannica—যাহা জগতের সকল জ্ঞাতব্য-অজ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ, তাহাতেও হিন্দু-জ্যোতিষের নামগন্ধ নাই—যেন অতি যত্নে উহাকে অনধিকার প্রবেশ হইতে নিবারণ করা হইয়াছে! জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ে Britannicaর প্রবন্ধ-লেখক প্রাচীন জ্যোতিষটা বেবিলনবাসী ও গ্রীকদিগের একচেটিয়া ছিল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কেবল

ব্রেণেণ্ড ( Brennand ) তাঁহার "হিন্দু জ্যোতিষ" শীর্ষক পুস্তকখানি লিখিবার সময় হেয় জাতিবৈষম্য ভুলিয়া পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছিলেন। তাই বেশ সহানুভূতিপূর্ণ ও সরল হৃদয়ে হিন্দুজ্যোতিষের প্রশংসা করিতে পারিয়াছেন। বেণ্টলী বা বেরী সাহেবের অথবা তাঁহাদের সমানধর্মী লেখকদিগের অবান্তর বিদ্বেষভাব সৌজন্য-বিরুদ্ধ। এইরূপ পক্ষপাতিত্ব একেবারেই প্রশংসার কথা নহে, বরং হিন্দু জ্যোতিষে তাঁহাদের অনভিজ্ঞতাই সূচিত করে। বিজ্ঞান-আলোচনা কালে আমাদিগের সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য,—বিজ্ঞান কোনও দেশবিদেশে আবদ্ধ নয়; ইহা প্রতীচ্য বা প্রাচ্য কাহারও একার সামগ্রী নহে, ইহা অফুরন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার হিসাবে সমগ্র মানবজাতির শ্লাঘ্য পিতৃপরিচয় ও বরেণ্য পৈত্রিক সম্পত্তি।

ইহাই প্রাচীন যুগের জ্যোতিষশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়; এবং ইহার পরেই আধুনিক যুগের পর্যবেক্ষণসাপেক্ষ জ্যোতিষশাস্ত্রের আরম্ভ। আমরা ইওরোপে Renaissance বা জ্ঞানোন্নতির পুনরুন্মেষের পূর্বকাল পর্যন্ত "প্রাচীন যুগ" আখ্যায় বিভাগ করিয়া, সেই সময়ের মধ্যে জ্যোতিষের যে ক্রমিক উন্নতি হইয়াছিল, অল্প পরিসরে তাহারই আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা দেখিলাম যে, অতি প্রাচীনকালেও জ্যোতিষশাস্ত্রের ক্রমোন্নতির সুস্পষ্ট পূর্বাভাষ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আরও দেখিলাম যে, প্রকৃত মৌলিক তথ্যের আবিষ্কার ক্ষেত্রে প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌গণের কৃতিত্ব একেবারেই অবহেলার যোগ্য নহে। তখনও তাঁহারা পৃথিবীর দৈনিক ও বার্ষিক গতির সবিশেষতত্ত্ব অবগত ছিলেন। তারকাপুঞ্জ যে নিশ্চল এবং পৃথিবীর গতিবশেই যে উহাদিগের উদয়াস্ত হইয়া থাকে ইহা আর্যভট স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। এমন কি, মাধ্যাকর্ষণের তথ্যটিও যে অঙ্কুর অবস্থায় ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণের

মনে স্থান পাইয়াছিল, ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বরাহমিহির লিখিয়াছেন, পৃথিবী কেন্দ্রের দিকে সকল বস্তুকে আকর্ষণ করিতেছে। ব্রহ্মগুপ্ত আরও একটু বিশদ করিয়া বলিয়াছেন, প্রাকৃতিক নিয়মে সকল বস্তুই পৃথিবীর অভিমুখে পতিত হয়; কারণ, পৃথিবীর প্রকৃতিই আকর্ষণ ও ধারণা করা,—যেমন জলের প্রকৃতি বহিয়া যাওয়া, অগ্নির প্রকৃতি দগ্ধ করা ও বায়ুর প্রকৃতি গতির সৃষ্টি করা। কিন্তু প্রাচীন যুগের জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা কালে একটি বিষয় আমাদিগের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা অনেক স্থলেই দেখিতে পাই, কেবল সাধারণ নিয়মগুলি (generalisations) লিপিবদ্ধ রহিয়াছে; অথচ সেই সাধারণ নিয়মে পৌঁছিবার পক্ষে যে বিচারপদ্ধতির আবশ্যকতা ছিল, তাহার বড় উদ্দেশ পাই না। অন্ততঃ হিন্দুজ্যোতিষের সম্বন্ধে এ কথাটা বিশেষরূপে প্রযোজ্য। বেশ বড় বড় বৈজ্ঞানিক গণনার নিয়মাবলী শ্লোকাকারে গ্রথিত রহিয়াছে, অথচ বিচার-প্রক্রিয়ার ( method of procedure ) নিদর্শন নাই। বোধ হয় ইহাতেই পাশ্চাত্য লেখকগণ অনেক সময়ে স্থির করেন যে, ঐ বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি দেশান্তরের জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে গৃহীত। কিন্তু আমাদের মনে হয়, উহার একটি বিশেষ কারণ আছে। ভারতবর্ষে পূর্ব্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৌখিক প্রসারের প্রচলন ছিল, শ্লোক আবৃত্তি বা গান গাওয়ার দ্বারা জ্ঞানের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকিত। জ্যোতিষশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। বিজ্ঞানের কোনও বিশেষ বিষয়ে উপদেশ দানকালে অধ্যাপক শিষ্যকে বিচার-পদ্ধতিগুলি বুঝাইয়া দিয়া সেই তথ্যটি স্মরণ রাখিবার জন্য একটি শ্লোকে সাধারণ নিয়মটি ( generalisation ) গ্রথিত করিয়া দিতেন, শিষ্যও সেইটি মুখস্থ করিয়া রাখিতেন, বিচার প্রক্রিয়াগুলি নিজে বুঝিয়া রাখিতেন। এইরূপে অধ্যাপকের পর অধ্যাপক কেবল শ্লোক রচন

করিয়া সাধারণ নিয়মটি গ্রথিত করিয়া রাখিতেন আর মুখে মুখে শিষ্যদিগকে বিচারপদ্ধতি শিখাইয়া দিতেন। ক্রমে যখন শ্লোক-সংখ্যা খুব অধিক হইয়া পড়িল, তখন কোনও এক শিষ্য সেগুলি তালপত্রে বা অন্য কিছুতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কিন্তু মাঝে এমন একটা সময় আসিল, যখন বিলাসের তরঙ্গে ভাসিয়া ভারতবাসী জ্ঞানের চর্চা ছাড়িয়া দিল,—জ্যোতির্বিজ্ঞান একেবারে ভুলিয়া গেল। তখন বিচার-প্রক্রিয়াগুলি বিস্মৃতির অতলগর্ভে লোপ পাইল,—কেবল শ্লোকগুলি কালের সর্ববিধ্বংসী গ্রাস হইতে বাঁচিয়া গেল। পরে ঐ শ্লোকগুলির সহিত প্রক্ষিপ্ত (interpolated) শ্লোকের মিশ্রণ হইতে লাগিল। শেষে একজন সংকলন-কর্তা মৌলিক ও প্রক্ষিপ্ত সব শ্লোক একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিলেন। এই প্রকারেই বোধ হয় হিন্দুদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ গ্রন্থ 'সূর্যসিদ্ধান্তে'র উৎপত্তি। কারণ, আমরা উহাতে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সহিত কুসংস্কারজড়িত প্রবচন বা গ্রহনক্ষত্রাদির স্তুতি-প্রশস্তিও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, দেখিতে পাই। 'সূর্যসিদ্ধান্তে'র দ্বাদশ অধ্যায়টি পাঠ করিলে এ বিষয় আমরা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। আমাদিগের দেশের জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনাকারীদিগের এখন কর্তব্য এই পূর্বকথিত আগাছা-পরগাছা বাদ দিয়া হিন্দুজ্যোতিষের মূলসূত্রগুলির পুনরুদ্ধার করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকে দেখাইতে চেষ্টা করা যে, আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্র কিরূপ উন্নতির উচ্চশিখরে উঠিতে পারিয়াছিল। কারণ, ইহা স্থির যে, পূর্বোক্ত যুক্তিতর্কের দ্বারা আমরা বেশ বুঝিতে পারি, বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে যে সাধনার প্রয়োজন, প্রাচীন মনীষিগণের তাহার অভাব ছিল না। সেই সাধনার সহিত তাঁহারা বাণীদেবীর চরণে আরও আনিয়াছিলেন আপনাদিগের জিজ্ঞাসু হৃদয়। তাই অনন্ত নভোমণ্ডলের অপূর্ব জ্যোতির্ময় গ্রহনক্ষত্রাদির আলোকনির্ঝরে

পুলক-বিহ্বল হইয়া মুগ্ধ প্রাণে সেই পরমসুন্দর সৃষ্টিকুশলী ভূতভাবনের উদ্দেশে তাঁহারা বলিয়া উঠিয়াছিলেন :

এতং মে সংশয়ং ছিন্ধি ভগবন্ ভূতভাবন।
অন্যোন ত্বামৃতে ছেত্তা বিদ্যতে সর্বদর্শিবান্।

## প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষের ধারা

হিন্দুদিগের প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা তাঁহাদিগের ধর্মানুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহারা পরমাপ্রকৃতির উপাসক ছিলেন; এই পরমাপ্রকৃতির উপাসনা করিতে করিতে তাঁহারা আকাশস্থ জ্যোতিষ্কপদার্থের মধ্যে পরমসুন্দর দৈবতগণের দর্শন পাইতেন এবং মনে করিতেন যে এই জ্যোতিষ্কদিগের গতিবিধি সম্বন্ধে কিছু কিছু অবগত হইতে না পারিলে দেবতাদিগের উপাসনা সম্পূর্ণ হইবে না। সুতরাং এই দেবতাদিগের পূজার জন্য তাঁহারা বেদে যে মন্ত্রাদি রচনা এবং পরে ব্রাহ্মণভাগে যে বিধি ও ক্রিয়াকলাপের উপদেশ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে জ্যোতিষসম্বন্ধীয় বা পঞ্জিকাসম্বন্ধীয় এমন অনেক বিষয় উল্লিখিত আছে যাহার দ্বারা আমরা পৃথিবীর আকার-প্রকার, আকাশীয় পদার্থের গতিবিধি, কালের গণনা প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু অবগত হইতে পারি। তবে বেদের মধ্যে এমন কিছু নাই, যাহাতে তাহাকে জ্যোতিষীয় গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। জ্যোতিষ শিক্ষা দেওয়া বেদের উদ্দেশ্যও ছিল না, কেবল ধর্মানুষ্ঠানের সম্পর্কে যেটুকু জ্যোতিষিক গণনার প্রয়োজন হইত, তাহারই উল্লেখ বেদে আছে।

### বৈদিক জ্যোতিষ

বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় রচিত হইয়াছিল। সংহিতায় জ্যোতিষসম্বন্ধীয় যে মত পাওয়া যায়, তাহা

ব্রাহ্মণভাগের মতের সহিত কতকাংশে ভিন্ন। সংহিতাভাগের কথাগুলি পদ্যে রূপকভাবে বর্ণিত, ইহার ভাবার্থ গ্রহণ করা সময়ে সময়ে দুষ্কর; ব্রাহ্মণভাগের কথাগুলি সুস্পষ্ট এবং তাহার মধ্যে কোন দ্বিভাব নাই। সুতরাং সংহিতাভাগের বাক্যগুলি যথাযথ বুঝিতে হইলে ব্রাহ্মণভাগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। এই পৃথিবী একটি গোলক ( sphere ), আকাশে নিরাধার শূন্যে অবস্থিত এবং সূর্য পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, ইহা বৈদিক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। বেদে এই ব্রহ্মাণ্ডকে তিন ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে, যথা : ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক। ইহা দ্বারা অন্তরীক্ষ যে বর্তমান তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই অন্তরীক্ষ পৃথিবীর চতুর্দিকে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ঋগ্বেদের কতক মন্ত্রে অন্তরীক্ষকে ঊর্ধ্ব ও অধঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; পৃথিবীর ঊর্ধ্বে যে অন্তরীক্ষ তাহাকে ঊর্ধ্ব অন্তরীক্ষ এবং পৃথিবীর নিম্নে যে অন্তরীক্ষ তাহাকে অধঃ অন্তরীক্ষ বলা হইয়াছে। এই অধঃ অন্তরীক্ষ দিয়া সূর্য রাত্রিকালে পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে গমন করেন। ঋগ্বেদ-সংহিতা হইতে ইহাও পাওয়া যায় যে সূর্যের কোন একটি রশ্মিকলা হইতে বিনির্গত অমৃত দ্বারা সোম ( চন্দ্র ) ক্রমশঃ পরিপূরিত হইয়া শুক্লপক্ষে দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন এবং কৃষ্ণপক্ষে তৃষ্ণার্ত দেবতারা এই অমৃত পান করিয়া ফেলেন বলিয়া চন্দ্র ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যান। বৈদিক দেবতাদিগের মধ্যে যম একটি চান্দ্র দেবতা, বৃহস্পতিও একটি চান্দ্র দেবতা, বরুণ একটি চান্দ্র দেবতা; মিত্রাবরুণ বলিতে সূর্য চন্দ্রকে বুঝাইতেছে। বৈদিক যুগে সম্ভবতঃ পঞ্চগ্রহের বিষয় জানা ছিল না, তাহা হইলে অবশ্যই ব্রাহ্মণভাগে রূপক ছন্দে পঞ্চ সংখ্যার উল্লেখ থাকিত। কিন্তু অধ্যাপক হিল্‌ব্রাণ্ট্ বলেন যে, বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টারা পঞ্চগ্রহের বিষয় অবগত ছিলেন; ঋগ্বেদ-সংহিতার "অধ্বর্যুভিঃ পঞ্চভিঃ সপ্তবিপ্রাঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে ( ৩, ৭, ৭ )

অধ্যাপক হিল্‌ব্রাণ্ট্‌ বলেন যে সপ্তবিপ্রাঃ অর্থে সপ্তর্ষি আর পঞ্চ অধ্বর্যু শব্দে পঞ্চগ্রহ বুঝাইতেছে। খুব সম্ভব এই অর্থই ঠিক।

সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগে পুনঃ পুনঃ অচল নক্ষত্রের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। রবিমার্গের ( ecliptic ) নিকটে যে-সকল উজ্জ্বল নক্ষত্র অবস্থিত, তাহাদেরই বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এই রবিমার্গস্থ নক্ষত্র ভিন্ন অতি অল্প সংখ্যক নক্ষত্রপুঞ্জেরই নামকরণ হইয়াছিল। বৈদিক গ্রন্থে ২৭টি নক্ষত্রের উল্লেখ প্রায় সর্বত্রই আছে ; তবে তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে ২৮টি নক্ষত্রের ( অভিজিৎকে ধরিয়া ) কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যেহেতু চন্দ্রের ভগণকাল ঠিক ২৭ দিনে হয় না, ২৭$\frac{১}{৩}$ দিনে হইয়া থাকে, সেই কারণে অভিজিৎ নক্ষত্রকে ধরা হইয়াছে ; এইখানে চন্দ্র $\frac{১}{৩}$ দিন অবস্থান করেন। প্রত্যেক দিনে চন্দ্র মহাবৃত্তপরিধির $\frac{১}{২৭}$ অংশ পরিভ্রমণ করেন ; এই $\frac{১}{২৭}$ অংশের যে নক্ষত্র উজ্জ্বল তাহাকেই সেই অংশের প্রধান নক্ষত্র বলিয়া প্রায় ধরা হইয়াছে। বেদে নক্ষত্রগুলির নামকরণ কৃত্তিকাকে প্রথম নক্ষত্র ধরিয়া করা হইয়াছে। মহাবিষুব বিন্দু ( vernal equinox ) হইতেই নক্ষত্রগুলির আরম্ভ ধরা হইয়া থাকে, কারণ গণনা মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতেই আরম্ভ হয়। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে, বেদের সময়ে কৃত্তিকানক্ষত্রে মহাবিষুবসংক্রান্তি হইত। গণনা করিয়া জানা যায় যে, খ্রীস্টীয় শতাব্দীর অন্ততঃ ২,০০০ বৎসর পূর্বে ইহা সম্ভব হইয়াছিল, সুতরাং বৈদিকযুগের জ্যোতিষ খ্রীস্টীয় শতাব্দীর অন্ততঃ ২,০০০ বৎসর পূর্ববর্তী।

## বেদাঙ্গ জ্যোতিষ

হিন্দুদিগের প্রাচীনতম জ্যোতিষ-গ্রন্থ বেদাঙ্গ জ্যোতিষ। ইহা বেদের অঙ্গস্বরূপ পরিশিষ্ট গ্রন্থ। পঞ্চবৎসরাত্মক যুগের কথা বেদাঙ্গ জ্যোতিষের

মূলকথা। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া পৌষ মাসের অমাবস্যাতে উক্ত যুগের শেষ হইয়া থাকে। ৩৬৬ সৌর দিনে, বা ছয় ঋতুতে, বা দুই অয়নে, বা বার সৌর মাসে এক বৎসর হয়। এই প্রকার পাঁচ বৎসরে এক যুগ হয়। এই যুগকে আরও পাঁচটি চান্দ্র বৎসরে বিভাগ করা হইয়াছে। এই পাঁচটি চান্দ্র বৎসরের মধ্যে তিনটি চান্দ্র বৎসরের প্রত্যেকটিতে বারটি চান্দ্র মাস এবং বাকী দুইটি বৎসরের প্রত্যেকটিতে তেরটি চান্দ্র মাস ধরা হইয়াছে। এক যুগে ৬২টি চান্দ্র মাস আর ৬০টি সৌর মাস, সুতরাং দুইটি চান্দ্র মাস মলমাস ধরা হইয়াছে।

বেদাঙ্গ জ্যোতিষ অনেকস্থলে অতি দুরূহ, উহার অর্থ সহজে বুঝা যায় না। উহার একস্থলে উল্লিখিত আছে, "শ্রবিষ্ঠার প্রারম্ভে সূর্য এবং চন্দ্র উত্তর দিকে প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্তু অশ্লেষার অর্ধভাগেই সূর্য দক্ষিণ দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। এই উত্তর দিকে ও দক্ষিণ দিকে প্রত্যাবর্তন মাঘ ও শ্রাবণ মাসে হইয়া থাকে।" এই শ্লোক হইতে অধ্যাপক প্র্যাট্‌ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই প্রকার উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন খ্রীষ্টপূর্ব ১,২০০ সালেই সম্ভব হইত। সুতরাং ইহা হইতে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ যে খ্রীষ্টপূর্ব ১,২০০ সালে রচিত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

## জৈন জ্যোতিষ

বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অল্প পরেই জৈনদিগের জ্যোতিষের আরম্ভকাল। জৈনদিগের তিনখানি জ্যোতিষ-গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি, চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি ও ভদ্রবাহবীয় সংহিতা। সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি পুথির আকারে মুদ্রিত পাওয়া যায়, চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তির একখানি পুথি বোম্বাইয়ে ভাণ্ডারকর ইনস্টিটিউটে সংরক্ষিত আছে, কিন্তু ভদ্রবাহবীয় সংহিতা এখন দুষ্প্রাপ্য।

জৈন বর্ধমান মহাবীর সূর্যপ্রজ্ঞপ্তির রচয়িতা বলিয়া খ্যাত; মহাবীরের মৃত্যুকালে খ্রীষ্টপূর্ব ৫২৭ সাল, সুতরাং সূর্যপ্রজ্ঞপ্তির রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ শতক হওয়াই সম্ভব। জৈনদিগের ধারণা ছিল যে, গ্রহনক্ষত্রের উদয় ও অস্তের কারণ সুমেরু পর্বত। সুতরাং তাঁহারা কল্পনা করিলেন যে, দুইটি সূর্য, দুইটি চন্দ্র, দুইটি করিয়া প্রতি গ্রহ ও দুইটি করিয়া প্রত্যেক নক্ষত্রপুঞ্জ জম্বুদ্বীপে অবস্থিত এবং ইহারা ক্রমান্বয়ে মেরুর উত্তর ও দক্ষিণে দৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহাতেই উদয়াস্তের অবতারণা। জৈন জ্যোতিষেও বেদাঙ্গ জ্যোতিষের মতই পঞ্চবৎসরাত্মক যুগের কল্পনা। অথচ প্রভেদ এই যে, বেদাঙ্গ জ্যোতিষে দক্ষিণায়নের অমাবস্যা হইতে যুগের আরম্ভ কল্পিত হইয়াছে, জৈন জ্যোতিষে উত্তরায়ণের পূর্ণিমা হইতে যুগারম্ভের কল্পনা করা হইয়াছে। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অনেক পরবর্তী হইলেও জৈন জ্যোতিষে অনেক অবৈজ্ঞানিক তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, হিন্দু জ্যোতিষের ক্রমিক উন্নতির ধারার সহিত জৈন জ্যোতিষের কোনও সম্পর্ক নাই, ইহা যেন কতকটা খাপছাড়াভাবে মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে।

## জ্যোতিষ-সংহিতা ও প্রাচীন জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত

হিন্দুদের জ্যোতিষশাস্ত্রের ইতিহাসে খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ সাল হইতে খ্রীষ্টাব্দ ৫০০ সাল পর্যন্ত কালকে অন্ধকার-যুগ বলা যাইতে পারে। কারণ, সূর্য-প্রজ্ঞপ্তির রচনাকাল হইতে আর্যভটের গ্রন্থপ্রণয়নের সময় পর্যন্ত যে এক হাজার বৎসরের ব্যবধান আছে, সে সময়ের কোনও জ্যোতিষিক গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। অথচ ইহাও মনে হয় না যে, এত কাল হিন্দু-জ্যোতিষের উন্নতির গতি স্থগিত ছিল। এই সময়কার জ্যোতিষিক জ্ঞানের পরিচয় তৎকালীন সাহিত্য ও দর্শনগ্রন্থে বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং

ইহাই সম্ভব যে, এই এক হাজার বৎসরের মধ্যে জ্যোতিষ-সংহিতাগুলি ও প্রাচীন জ্যোতিষ-সিদ্ধান্তগুলি রচিত হইয়াছিল। জ্যোতিষ-সংহিতাগুলি এখন একেবারে দুষ্প্রাপ্য; শোনা যায়, ডক্টর কার্ণ গর্গসংহিতার একখানি ছিন্ন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তবে সংহিতাগুলিতে কি কি বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল তাহা জানিতে পারা যায় পরবর্তী জ্যোতির্বিদ্‌গণের রচনায় উহাদের উল্লেখ হইতে। পরবর্তী সময়ের জ্যোতিষগ্রন্থে সাধারণতঃ গর্গসংহিতা ও পরাশরসংহিতার নামোল্লেখ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। গর্গ ও পরাশর খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ শতকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর দুইটি সংহিতার উল্লেখ পাওয়া যায় বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায়, সে দুইটি দেবল ও কাশ্যপ রচিত; কিন্তু এগুলি গর্গসংহিতা ও পরাশরসংহিতার অনেক পরবর্তী রচনা।

সংহিতা-যুগের পরেই রচিত হইয়াছিল প্রাচীন জ্যোতিষ-সিদ্ধান্তগুলি। আবুলফজল-কৃত আইন-ই-আক্‌বরী গ্রন্থে এই কয়টি সিদ্ধান্তগ্রন্থের উল্লেখ আছে,—(১) ব্রহ্ম, (২) সূর্য, (৩) সোম, (৪) বৃহস্পতি, (৫) গর্গ, (৬) নারদ, (৭) পরাশর, (৮) পুলস্ত্য, (৯) বশিষ্ঠ, (১০) ব্যাস, (১১) অত্রি, (১২) কাশ্যপ, (১৩) মরীচি, (১৪) মনু, (১৫) অঙ্গিরস্, (১৬) লোমশ, (১৭) পুলিশ, (১৮) যবন, (১৯) ভৃগু, ও (২০) চ্যবন। ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিটি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, এবং তাহাদের মূলসূত্রগুলিই পরবর্তী কালে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তগুলিও প্রায় দুষ্প্রাপ্য। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে অংশস্বরূপ সন্নিবিষ্ট আছে, ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই পরবর্তী কালে ব্রহ্মগুপ্ত তাঁহার ব্রাহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্ত রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ে বরাহমিহির তদ্‌রচিত পঞ্চসিদ্ধান্তিকা নামক সংকলনগ্রন্থে এই পাঁচটি সিদ্ধান্তগ্রন্থ সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন—পৈতামহ (ব্রহ্ম), বশিষ্ঠ, রোমক, পৌলিশ ও সৌর। ইহাদিগের মধ্যে

সৌরসিদ্ধান্তকেই তিনি প্রথম স্থান দিয়াছেন। বর্তমান সূর্যসিদ্ধান্তও এই সৌরসিদ্ধান্তের মূলসূত্র লইয়া রচিত। রোমক সিদ্ধান্তটি গ্রীস অথবা রোম দেশের জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে গৃহীত, ইহার আলোচনা-পদ্ধতির সহিত হিন্দুজ্যোতিষ-গ্রন্থের আলোচনা-পদ্ধতির অনেক প্রভেদ এবং ইহা হিন্দুদিগের নিকট আদৌ প্রশংসালাভ করিতে পারে নাই।

## বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষ

কিন্তু হিন্দুদিগের বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষ আরম্ভ হইল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে আর্যভটের আবির্ভাবের সময় হইতে। আর্যভট দুইখানি জ্যোতিষ-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেবল আর্যভটীয়-খানি এখন পাওয়া যায়। আর্যভট সূর্যসিদ্ধান্তকে ভিত্তি করিয়াই তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আর্যভট ভূভ্রমবাদ বিশ্বাস করিতেন, তিনিই নীচোচ্চবৃত্ত ও প্রতিবৃত্তের সাহায্যে গ্রহদিগের গতির ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং দেখাইয়াছিলেন যে গ্রহদিগের গতিপথ ঠিক বৃত্তাকার নহে, উহা অনেকটা বৃত্তাভাসের (ellipse) আকৃতিবিশিষ্ট। আর্যভটের পরেই বরাহমিহির, ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে। তিনি ছিলেন প্রধানতঃ সংকলন-কর্তা। তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে— বৃহৎসংহিতা ও পঞ্চসিদ্ধান্তিকা; প্রথমখানি ফলিত জ্যোতিষ ও গণিত জ্যোতিষ দুই বিষয়েরই আলোচনা করিয়াছে এবং প্রাচীন সংহিতাগ্রন্থকে ভিত্তি করিয়াই রচিত; দ্বিতীয়খানি একটি করণ-গ্রন্থ, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত-গুলির ন্যায় উহা নিয়মপদ্ধতিগুলির বিশদব্যাখ্যা করে নাই, কেবল গণনার সুবিধার জন্য সংক্ষেপে নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছে। বরাহমিহিরের একটা বড় কৃতিত্ব বর্ষারম্ভকে পরিবর্তিত করা। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময়ে দক্ষিণায়নে বর্ষ আরম্ভ হইত, কিন্তু মেষক্রান্তিবিন্দুর

অয়নচলনের নিমিত্ত বরাহমিহিরের সময়ে উহাতে ভুল হইত, সুতরাং বরাহমিহির বর্ষারম্ভ-নির্ধারণে একটি পরিবর্তন প্রচলিত করিলেন। তিনি নক্ষত্রতালিকার আরম্ভ করিলেন অশ্বিনী হইতে, ইহার পূর্বে উহার আরম্ভ ছিল কৃত্তিকা হইতে। বরাহমিহির কর্তৃক এই পরিবর্তিত বর্ষারম্ভ-পদ্ধতি এখনও চলিয়া আসিতেছে। বরাহমিহিরের সমসাময়িক ছিলেন জ্যোতিষী লল্লাচার্য। তিনি আর্যভটের রচনাকে ভিত্তি করিয়া শিষ্যধীবৃদ্ধিদ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। আপনাকে আর্যভটের শিষ্য বলিয়া প্রচারিত করিলেও তিনি গুরুর ভূভ্রমবাদ বিশ্বাস করিতেন না। তিনি বলিতেন, পৃথিবী যদি এত দ্রুতবেগে পরিক্রমণ করিতে থাকে, তাহা হইলে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত পদার্থ প্রক্ষেপস্থানের পশ্চিমে পতিত হয় না কেন, মেঘ সকল কেবল পশ্চিমেই যায় না কেন?

বরাহমিহিরের প্রায় সমসাময়িক এক জ্যোতিষী ছিলেন, তাঁহার নাম ভাস্কর। ইনি সিদ্ধান্তশিরোমণির রচয়িতা প্রসিদ্ধ ভাস্করাচার্য নহেন; ইনি আর্যভটের রচনাকে ভিত্তি করিয়া বৃহৎভাস্করীয় ও লঘুভাস্করীয় নামে দুইখানি জ্যোতিষ-গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। আনুমানিক ৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইহার পরে জ্যোতির্বিদ হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ব্রাহ্মস্ফুটগ্রন্থ-প্রণেতা বিখ্যাত জ্যোতিষী ব্রহ্মগুপ্ত। তিনি ত্রিশ বৎসর বয়সে ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত সমগ্র এশিয়াখণ্ডে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল; ৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ বিন ইব্রাহিম আল ফাজারি আরবী ভাষায় উহার অনুবাদ করিয়াছিলেন, এই অনুবাদ সিন্দহিন্দ নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মগুপ্ত-রচিত আর একখানি গ্রন্থ— খণ্ডখাদ্যক নামে করণগ্রন্থও আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল, এই অনুবাদ অলর্কন্দ নামে খ্যাত। ব্রহ্মগুপ্তও ভূভ্রমবাদের অস্বীকার

করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে তাঁহার এত অধিক প্রসিদ্ধি ছিল যে, কোন জ্যোতিষী আর্যভটের ভূভ্রমবাদ অনুমোদন করিতে সাহস পাইতেন না।

ব্রহ্মগুপ্তের পরে কিছু কাল প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদের অভাব লক্ষিত হয়। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে আসিলেন 'লঘুমানস' নামক করণগ্রন্থ-প্রণেতা মুঞ্জাল। তিনি নিশ্চিতই বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, কারণ অয়নাংশ বাহির করিবার যে নিয়মপদ্ধতি তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা ভারতবরেণ্য জ্যোতির্বিদ ভাস্করাচার্যও গ্রহণ করিয়া মুঞ্জালের ঋণ স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্তী ছিলেন শ্রীপতি। তিনি ধীকোটি নামে একটি করণগ্রন্থ এবং সিদ্ধান্তশেখর নামে একটি সিদ্ধান্তগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্তী লেখক ধারারাজ ভোজ। তিনি রাজমৃগাঙ্ক নামে একটি করণগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পরবর্তীকালে জ্যোতির্বিদ শতানন্দ পঞ্জিকাকারগণের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'ভাস্বতী' সূর্যসিদ্ধান্তের মূলসূত্রগুলিকে ভিত্তি করিয়া রচিত এবং পঞ্জিকা-প্রণয়নের বিশেষ উপযোগী; পঞ্জিকাকারগণ "ভাস্বতীগ্রহণে ধন্যা" বলিয়া ইহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। শতানন্দের ভাস্বতী ১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।

এইবার ভারতের জ্যোতিষক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন ভারত-জ্যোতিষের মুকুটমণি ভাস্করাচার্য; তিনি ৩৬ বৎসর বয়সে ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সিদ্ধান্তশিরোমণি রচনা করিয়াছিলেন। উহা দুই ভাগে বিভক্ত—গোলাধ্যায় ও গ্রহগণিতাধ্যায়। ইহার অনেক পরে ৬৯ বৎসর বয়সে তিনি করণকুতূহল নামে একখানি করণগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ভাস্করাচার্যের প্রতিভা বিশ্ববিশ্রুত। তিনি গণিত-জ্যোতিষের সকল দিক্ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা করিয়া

গিয়াছেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষগ্রন্থে উল্লিখিত অধিকাংশ বিষয়ের আলোচনা আমরা সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে দেখিতে পাই; গ্রহপতি-মীমাংসা, অয়নাংশনির্ধারণ, লম্বননির্ণয় ( parallax ), গ্রহযুতি ( conjunction of planets ), বলনমীমাংসা, গ্রহণ-গণনা প্রভৃতি জ্যোতিষশাস্ত্রের দুরূহ আলোচনাগুলি এমন সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, তাহা পাঠকমাত্রের গভীর বিস্ময়ের উদ্রেক না করিয়া পারে না। কিন্তু এইখানেই হিন্দুজ্যোতিষের উন্নতির ইতিহাসে যবনিকাপতন। দীপনির্বাণের পূর্বে যেমন অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখা দেয়, ভাস্করাচার্যও ছিলেন ভারতীয় জ্যোতিষ-ক্ষেত্রে সেইরূপ শেষ প্রদীপ্ত শিখা। ইহার পরে ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গণিত-জ্যোতিষের গবেষণা বন্ধ হইয়া যায়।

## ভচক্র ও রাশিচক্র

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ও অন্য দেশে আকাশে চন্দ্র ও সূর্যের গতিপর্যবেক্ষণ দ্বারা মাস ও বৎসর গণনা করা হইত। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় এক অমাবস্যা হইতে পুনরায় অমাবস্যা পর্যন্ত, অথবা এক পূর্ণিমা হইতে পুনরায় পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রায় ৩০ দিন অতিবাহিত হয়; প্রাচীনকালে ইহাকেই মাস বলা হইত। কিন্তু যখন দেখিতে পাওয়া গেল যে, এক পূর্ণিমার দিনে কোনও নির্দিষ্ট নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের মিলন হইলে পুনরায় ঐ নক্ষত্রের সহিত মিলিত হইতে চন্দ্রের মাত্র ২৭ দিনের অল্প অধিক সময় লাগিয়া থাকে, অথচ সেই সময়ে তথায় পূর্ণিমা না ঘটিয়া তাহার প্রায় ২½ দিন পরে পূর্ণিমা ঘটে— তখন স্থির হইল যে, চন্দ্র ২৭ দিনের কিঞ্চিৎ অধিক কালে নিজের কক্ষে একটি আবর্তন সম্পন্ন করে, কিন্তু সূর্যের প্রতীয়মান গতির নিমিত্ত আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে পরে সূর্যের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থানের কালে পূর্ণিমা ঘটিয়া থাকে। এই প্রকারে চন্দ্রের গতির একটা শৃঙ্খলা আনিবার চেষ্টা হইতেই নক্ষত্রমণ্ডলে সূর্যের গতি প্রতিপন্ন হইয়াছিল। এদিকে এক এক পূর্ণিমাতে চন্দ্র যথাক্রমে প্রায় ২½ দিনের পথ অগ্রসর হইয়া চলিতে থাকিলে দেখা গেল যে, দ্বাদশ পূর্ণিমার পর ঐ দ্বাদশ "মাসে" সূর্যও নক্ষত্রমণ্ডলে প্রায় একটি পূর্ণ আবর্তন সম্পন্ন করিল। এই পূর্ণ সময় তখন বৎসর নামে অভিহিত হইল এবং এই হইতেই দ্বাদশ মাসে বৎসরগণনা আরম্ভ হইল।

এই সময়ে চন্দ্রের গতিপথ ও সূর্যের প্রতীয়মান গতিপথ লক্ষিত

হইলে নক্ষত্রের দ্বারা তাহাদের নির্ণয়ের উপক্রম করিলে দেখা গেল যে, সূর্য ও চন্দ্রের তলভাগ এক সমতলে নহে, এবং আরও লক্ষিত হইল যে, চন্দ্র প্রতিমাসে ঠিক একই পথে চলিতেছে না, চন্দ্রের কক্ষ যেন অল্পে অল্পে ক্রান্তিবৃত্তের উপর দিয়া সরিয়া যাইতেছে। সুতরাং চন্দ্রের দৈনন্দিন গতি স্থির করিবার উপায় নির্ধারণ করা প্রয়োজন হইল। যখন দেখা গেল যে, চন্দ্রের কক্ষ নক্ষত্রমণ্ডলে স্থির থাকিতেছে না, তখন সূর্যের প্রতীয়মান গতিপথ অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্তের উভয় পার্শ্বে যতদূর পর্যন্ত চন্দ্রের গতি বিস্তৃত হয়, আকাশ-গোলকের ততদূর প্রশস্ত একটি কটিবন্ধ কল্পিত হইল এবং ক্রান্তিবৃত্ত ইহার মধ্যরেখা রূপে নির্দিষ্ট হইল। এই কটিবন্ধকে 'ভচক্র' আখ্যায় অভিহিত করিয়া সপ্তবিংশতি ভাগে বিভক্ত করা হইল, এবং প্রত্যেক ভাগ 'ভ' অথবা 'নক্ষত্র' নামে পরিচিত হইল।

প্রাচীন হিন্দুগণের গণনা করিবার দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতি ছিল,—একটি চান্দ্র তিথির দ্বারা, অপরটি রাশির দ্বারা। প্রথমটি দ্বিতীয়টির বহুপূর্বে আবিষ্কৃত। তিথিবিভাগ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, হিন্দুরা চন্দ্রের দৈনিক গতি নির্দেশ করিবার জন্য ক্রান্তিবৃত্তকে প্রথমে ২৮ ভাগে, পরে ২৭ ভাগে বিভক্ত করেন। এই ২৭টি চন্দ্রবিভাগ সূচিত করিবার জন্য হিন্দুরা ২৭টি তারকাপুঞ্জ স্থির করিয়াছিলেন। প্রতি পুঞ্জের উজ্জ্বলতম তারকাটিকে তাঁহারা যোগতারা বলিতেন এবং সমগ্র পুঞ্জটিকে 'নক্ষত্র' বা 'ভ' আখ্যা দিয়াছিলেন। ঐ যোগতারা প্রতি বিভাগের আদিপ্রান্ত সূচিত করিত। এইরূপে প্রত্যেক বিভাগ বিভাগীয় নক্ষত্রের ন্যায় নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিত, এবং সেই নির্দিষ্ট বিভাগগুলির সাহায্যে চন্দ্রের দৈনিক গতি স্থিরীকৃত হইত। প্রত্যেক বিভাগে যে তারাগুলি অবস্থিত ছিল,

তাহাদিগকে এক-একটি মণ্ডল কল্পনা করিয়া হিন্দুরা তাহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আখ্যা দিলেন। এই সকল নক্ষত্রমণ্ডলের নাম যথাক্রমে—

| | | শ্রীপতির মতে মণ্ডলের তারকার সংখ্যা | কোলব্রুকের মতে মণ্ডলের প্রধান তারকা |
|---|---|---|---|
| (১) | অশ্বিনী | ৩ | α Arietis |
| (২) | ভরণী | ৩ | β Musca |
| (৩) | কৃত্তিকা | ৬ | π Tauri |
| (৪) | রোহিণী | ৫ | α Tauri |
| (৫) | মৃগশিরা | ৩ | λ Orionis |
| (৬) | আর্দ্রা | ১ | α Orionis |
| (৭) | পুনর্বসু | ৪ | β Geminorum |
| (৮) | পুষ্যা বা তিষ্যা | ৩ | δ Cancri |
| (৯) | অশ্লেষা | ৫ | α I and 2 Cancri |
| (১০) | মঘা | ৫ | α Leonis |
| (১১) | পূর্ব্বফল্গুনী | ২ | δ Leonis |
| (১২) | উত্তরফল্গুনী | ২ | β Leonis |
| (১৩) | হস্তা | ৫ | γ and δ Corvi |
| (১৪) | চিত্রা | ১ | α Virginis |
| (১৫) | স্বাতী | ১ | α Bootes |
| (১৬) | বিশাখা | ৪ | α or κ Libræ |
| (১৭) | অনুরাধা | ৪ | δ Scorpionis |
| (১৮) | জ্যেষ্ঠা | ৩ | α Scorpionis |
| (১৯) | মূলা | ১১ | λ Scorpionis |
| (২০) | পূর্ব্বাষাঢ়া | ২ | δ Sagittarii |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (২১) | উত্তরাষাঢ়া | ২ | τ Sagittarii |
| (২২) | শ্রবণা | ৩ | α Aquilæ |
| (২৩) | ধনিষ্ঠা | ৪ | α Delphini |
| (২৪) | শতভিষা | ১০ | λ Aquarie |
| (২৫) | পূর্বভাদ্রপদ | ২ | α Pegasi |
| (২৬) | উত্তরভাদ্রপদ | ২ | α Andromedæ |
| (২৭) | রেবতী | ১২ | ζ Piscium |

ইহা ভিন্ন প্রথমে আর একটি মণ্ডল কল্পিত হইয়াছিল। উহার নাম অভিজিৎ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| (২৮) | অভিজিৎ | ৩ | α Lyræ |

এই নক্ষত্রমণ্ডলসমূহের মধ্যে চন্দ্র যে দিবস যে মণ্ডল অতিক্রম করিয়া থাকে, সেই দিবসে তাহাকে সেই নক্ষত্রের ভোগস্থিত বলা হয়। হিন্দু পুরাণে এই নক্ষত্রগুলি চন্দ্রের সপ্তবিংশতি পত্নীরূপে কল্পিত হইয়াছে। ভচক্র ও নক্ষত্রবিভাগের উল্লেখ হিন্দুজ্যোতিষ ভিন্ন অন্য কোনও দেশের জ্যোতিষ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। হিন্দুজাতির মধ্যে পুরাণাদি প্রণয়নের বহু পূর্বেই ইহাদিগের উদ্ভাবন হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান যুক্তিসিদ্ধ।

যাহা হউক, তিথিগণনায় ক্রান্তিবৃত্তের এই ২৭টি বিভাগের বিশেষ প্রয়োজন থাকিলেও, চন্দ্রের দৈনিক গতির একটা শৃঙ্খলা নাই বলিয়া জ্যোতিষগণনাকালে উহার তত উপযোগিতা নাই। সুতরাং রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশিতে বিভাগ আবশ্যক হইয়া পড়িল। প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণ পর্যবেক্ষণ দ্বারা দেখিলেন যে, চন্দ্র ও গ্রহগণ ক্রান্তিবৃত্ত হইতে অধিক দূরে কখনই দৃষ্ট হয় না। সেইজন্য তাঁহারা উক্ত বৃত্তের উত্তরে ও দক্ষিণে প্রায় আটঅংশবিস্তৃত একটি গোলাকার পথের কল্পনা করিলেন এবং উহাকে রাশিচক্র আখ্যায় অভিহিত করিলেন। তাঁহারা এই রাশিচক্রকে

দ্বাদশটি সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া উক্ত বিভাগগুলির মধ্যে যে সকল নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের দ্বারা দ্বাদশটি বিভিন্ন মূর্তি কল্পনা করিলেন। এবং তাহাদের নাম দিলেন রাশি। রাশি সম্বন্ধে পূর্বে বিশদ আলোচনা করিয়াছি।

ভারতে এখনও ধর্মানুষ্ঠানের জন্য তিথিবিভাগের ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সৌরমাসের ব্যবস্থা কখন এবং কেন কল্পিত হইয়াছিল? দীর্ঘকালব্যাপী পর্যবেক্ষণ ফলে প্রাচীন জ্যোতির্বিগণ এই সমস্যায় উপনীত হইলেন যে, দ্বাদশ চান্দ্র মাসে এক সৌর বৎসর পূর্ণ হয় না, অথচ দ্বাদশ মাসে বৎসরগণনা লৌকিক প্রথায় পরিণত হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রের গতি এত স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যায় যে, তাহার সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা কেবলমাত্র সময়সাপেক্ষ। আরও দেখা গেল যে, দ্বাদশ চান্দ্রমাসে মাত্র ৩৫৪ সৌর দিবস হইয়া থাকে, কিন্তু এক সৌর বৎসরে প্রায় ৩৬৫ দিন হইবে। অথচ বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতে চান্দ্রমাস ধর্মানুষ্ঠানের কাল নির্ণয়ার্থ ব্যবহৃত হওয়ায়, উহার ব্যবহার একপ্রকার ধর্মের অঙ্গস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং প্রাচীন জ্যোতির্বিগণ ধর্মার্থে চান্দ্রমাসের ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখিলেন এবং লৌকিক কালবোধার্থে কৃত্রিম সৌরমাসের কল্পনা করিলেন। এই ব্যবস্থামতে ভচক্র দ্বাদশ সমভাগে বিভক্ত হইল এবং প্রত্যেক বিভাগ 'রাশি' নামে অভিহিত হইল। তখন ভচক্রের অপর এক নাম হইল রাশিচক্র। সূর্য যে সময়ে এক এক রাশি পরিক্রমণ করে, সে সময়কে সৌরমাস বলা হইল।

রাশিচক্রের দ্বাদশ বিভাগে বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জের বিভিন্ন কল্পিত মূর্তিভেদে তাহাদিগের নাম যথাক্রমে:

| হিন্দুদিগের কল্পিত-মূর্তিভেদে নাম ও তাহার প্রতিশব্দ | ক্যালডীয়ান বা মিশরবাসীদিগের কল্পিত-মূর্তিভেদে নামের ইংরাজি প্রতিশব্দ | চীনবাসীগণের কল্পিত-মূর্তিভেদে নামের ইংরাজি প্রতিশব্দ |
|---|---|---|
| ১। মেষ (Aries) | 1. The Ram | 1. The Mouse |
| ২। বৃষ (Taurus) | 2. The Bull | 2. The Ox or Cow |
| ৩। মিথুন (Gemini) | 3. The Twins | 3. The Tiger |
| ৪। কর্কট (Cancer) | 4. The Crab | 4. The Hare |
| ৫। সিংহ (Leo) | 5. The Lion | 5. The Dragon |
| ৬। কন্যা (Virgo) | 6. The Virgin | 6. The Serpent |
| ৭। তুলা (Libra) | 7. The Balance | 7. The Horse |
| ৮। বৃশ্চিক (Scorpio) | 8. The Scorpion | 8. The Sheep |
| ৯। ধনুঃ (Sagittarius) | 9. The Archer | 9. The Archer |
| ১০। মকর (Capricornus) | 10. The Goat | 10. The Cock |
| ১১। কুম্ভ (Aquarius) | 11. The water-bearer | 11. The Dog |
| ১২। মীন (Pisces) | 12. The Fishes | 12. The Boa |

এই স্থলে আমরা দেখিতে পাই, হিন্দুদিগের কল্পিত নামকরণে এবং মিশরবাসীদিগের নামকরণে বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই, কিন্তু চীনবাসীদিগের নামকরণের সহিত কেবল তিনটি নামে মিল আছে; অবশিষ্ট নামের সহিত অমিল লক্ষিত হয়। অথচ তিন দেশের নামকরণেই সংখ্যা দ্বাদশ।

রাশিচক্রের সহিত ভচক্রের মিল রাখিবার উদ্দেশ্যে হিন্দুজ্যোতির্বিদগণ মেষরাশির আদি এবং অশ্বিনীনক্ষত্রের আদি এক বিন্দুতে স্থাপিত করিলেন। ইহা হইতে প্রত্যেক ২$\frac{1}{4}$ নক্ষত্রে এক রাশির পরিমাণ স্থির হইল; যেমন, অশ্বিনী, ভরণী ও কৃত্তিকার প্রথম পাদ (অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ) ধরিয়া মেষরাশি; কৃত্তিকার অবশিষ্ট তিন পাদ এবং রোহিণী

ও মৃগশিরার অর্ধেক লইয়া বৃষরাশি। এইরূপে নক্ষত্রবিভাগের দ্বারা অন্য সকল রাশির পরিমাণ নির্দিষ্ট হইল।

পূর্বেই দেখা গিয়াছে যে, ক্রান্তিবৃত্ত বিষুববৃত্তের সহিত বক্রভাবে অবস্থিত এবং এই দুই বৃত্তের সম্পাত স্থলে সূর্য অবস্থিত হইলে দিবাভাগ ও রাত্রিভাগ সমান হইয়া থাকে। এই সম্পাতদ্বয় 'বিষুববিন্দু' বা সংক্ষেপে 'বিষুবন্' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাদের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য এক বিন্দুর নাম "মহাবিষুব" এবং অপরটির নাম 'জলবিষুব' রাখা হইয়াছিল এবং সূর্য যে দিন 'মহাবিষুব' অতিক্রম করে, ঐ দিনকে গ্রীষ্মারম্ভ বলা হইয়াছিল। বিষুবদ্বয় ক্রান্তিবৃত্তে অবস্থিত হওয়ায় প্রাচীন ঋষিগণ বহুপূর্বকালে অতি অল্পায়াসেই ভচক্রে ইহাদের স্থিতি নির্দেশ করিয়াছিলেন এবং পর্যবেক্ষণের ফলে ইহাও জানিয়াছিলেন যে বিষুববিন্দুদ্বয় চন্দ্রকক্ষের রাহু ও কেতু বিন্দুদ্বয়ের ন্যায় ভচক্রে আবর্তিত হইতেছে। বিষুবের এই গতিকে তাঁহারা "অয়নচলন" নামে অভিহিত করিলেন। যে সময়ে রাশিচক্রবিভাগের দ্বারা সৌরমাসের সূচনা করা হইয়াছিল,— সেই সময়ে মহাবিষুব মেষরাশির আদিতে অবস্থিত ছিল; এই কারণে সূর্যের মেষরাশিতে প্রবেশের কালকে গ্রীষ্মারম্ভ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। রাশির অনুক্রমে সৌরমাসের বিভাগ যথাক্রমে:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| মেষরাশির পরিক্রমণকাল | | ... | বৈশাখ | (৩১ সৌর দিন) |
| বৃষরাশির | " | ... | জ্যৈষ্ঠ | (৩১½ " ") |
| মিথুনরাশির | " | ... | আষাঢ় | (৩১½ " ") |
| কর্কটরাশির | " | ... | শ্রাবণ | (৩১½ " ") |
| সিংহরাশির | " | ... | ভাদ্র | (৩১½ " ") |
| কন্যারাশির | " | ... | আশ্বিন | (৩০½ " ") |
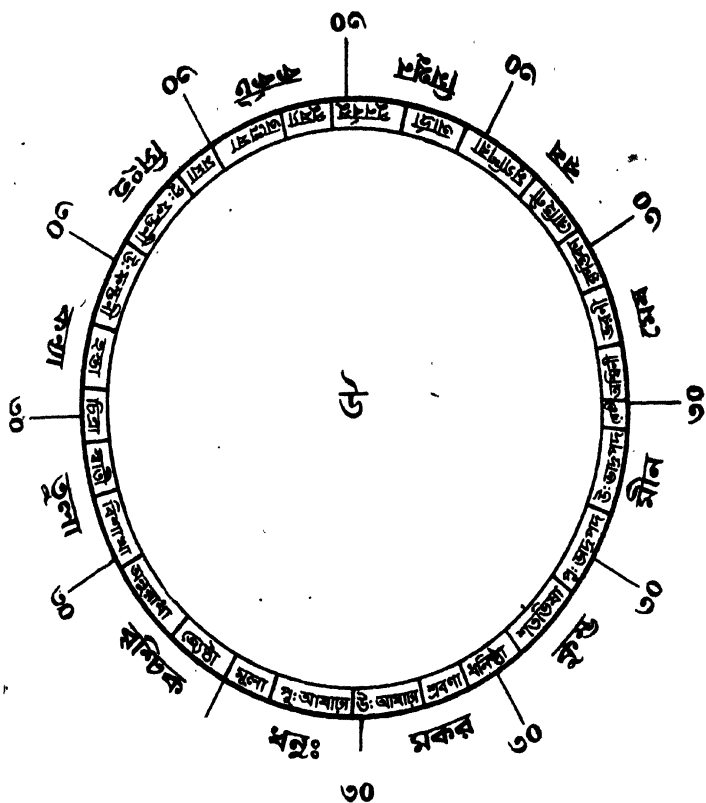
ক্রান্তিবৃত্তের দ্বাদশ রাশি বিভাগ ও নাক্ষত্রিক বিভাগ

অশ্বিনী
ভরণী
কৃত্তিকা
রোহিণী
মৃগশিরা
আর্দ্রা
পুনর্ব্বসু
রেবতী
উত্তরভাদ্রপদ
পূর্ব্বভাদ্রপদ
শতভিষা
ধনিষ্ঠা
শ্রবণা
উত্তরাষাঢ়া
পূর্ব্বাষাঢ়া
মেষ
মীন
কুম্ভ
মকর
বৃষ
মিথুন
কর্কট
ঘ
ক
গ
ঙ
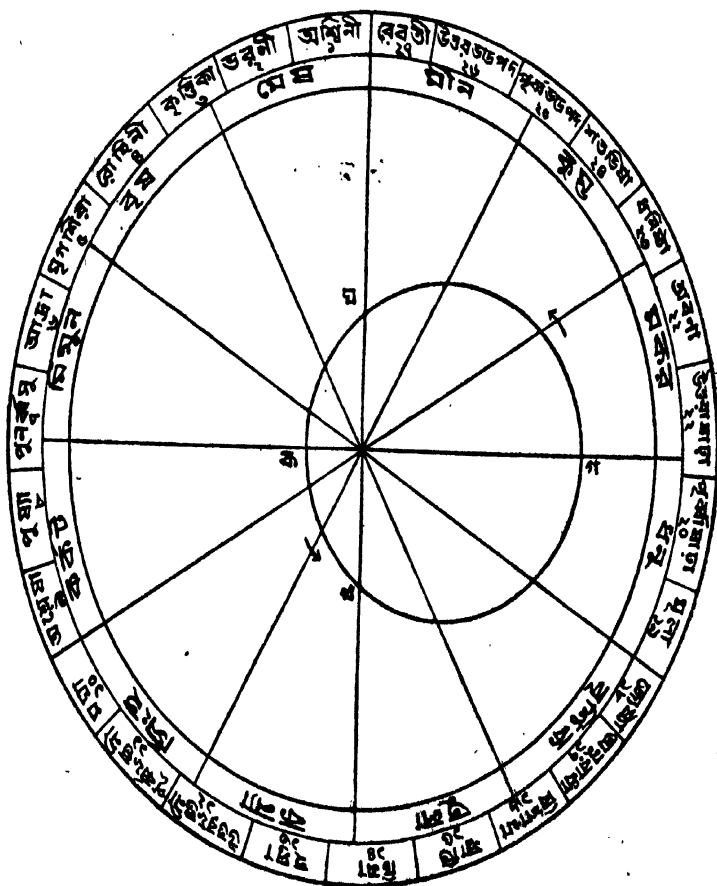
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| তুলারাশির | পরিক্রমণকাল | ... | কার্তিক | (৩০ সৌর দিন) |
| বৃশ্চিকরাশির | " | ... | অগ্রহায়ণ | (২৯½ " ") |
| ধনুরাশির | " | ... | পৌষ | (২৯ " ") |
| মকররাশির | " | ... | মাঘ | (২৯ " ") |
| কুম্ভরাশির | " | ... | ফাল্গুন | (৩০ " ") |
| মীনরাশির | " | ... | চৈত্র | (৩১½ " ") |

এই তালিকা হইতে বুঝা যায় যে, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের দিনসংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক এবং পৌষ ও মাঘ মাসের দিনসংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম। পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রের দ্বারা ইহার কারণ অনায়াসেই বোধগম্য হইবে। চিত্রমধ্যস্থ ডিম্বাকৃতি ক্ষেত্র পৃথিবীর কক্ষ, তাহার বহির্দেশে যে চক্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা রাশিচক্র এবং উহাতে রাশি-সকল নাম দ্বারা আর নক্ষত্রসকল নাম ও ক্রমানুযায়ী সংখ্যার দ্বারা সূচিত হইয়াছে।

পৃথিবী যখন স্বীয় কক্ষে শরনির্দেশিত পথে চলিতে থাকে তখন সূর্যকে এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন করিতে দেখা যায়। সূর্য যখন মেষবৃষাদি রাশি পরিভ্রমণ করিতেছে, তখন পৃথিবী 'খ' হইতে 'গ' বিন্দুর দিকে অগ্রসর হয় এবং সূর্য হইতে তাহার দূরত্ব বর্ধিত হইতে থাকে। এই কারণে পৃথিবীর গতি মৃদু হয় এবং পৃথিবীর গতির অনুক্রমে সূর্যকেও ধীরে ধীরে পরিক্রমণ করিতে দেখা যায়। পুনরায় যখন পৃথিবী 'ক' বিন্দুর নিকটবর্তী থাকে, তখন সূর্য হইতে উহার দূরত্ব অতিশয় হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সেই কারণে পৃথিবীর গতি দ্রুত হয় এবং সূর্যকে দ্রুতগতিতে ধনু ও মকর রাশি পরিক্রমণ করিতে দেখা যায়।

এখন দেখা যাক, ক্রান্তিবৃত্তের ২৭ নক্ষত্রে বিভাগ এবং রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশিতে বিভাগ—এই দুইটি বিভাগের আবিষ্কর্তা কে? এই বিষয়

ইতঃপূর্বে কিছু আলোচনা করিয়াছি। বায়ট্ (Biot) সাহেব বলেন যে প্রথমে চৈনিক জ্যোতিষিগণ সিউ (Sieu) নাম দিয়া ক্রান্তিবৃত্তের বিভাগ আবিষ্কার করেন। পরে উহা হইতে হিন্দুদিগের নক্ষত্র ও আরবদিগের মঞ্জিল উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু অধ্যাপক বেবর (Weber) সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, চীনবাসীদিগের সিউ ও আরবদিগের মঞ্জিল হিন্দুদিগের পরবর্তী কালের বিভাগ হইতে গৃহীত। এই বিভাগে উপনীত হইবার পূর্বে হিন্দু জ্যোতিষকে বিবিধ স্তর পার হইয়া আসিতে হইয়াছে। তিনি বলেন যে, চন্দ্রের গতি-নির্ণয়ের জন্য তিথিবিভাগ হিন্দু জ্যোতিষীর গবেষণাসম্ভূত; এবং পরে আরববাসীরা উহার অনুকরণে মঞ্জিল বাহির করিয়াছেন। কিন্তু এই স্থলেই আবার অধ্যাপক বেবর যে বলিয়াছেন, বেবিলন দেশের (মিশর দেশের) জ্যোতির্বিদ্‌গণ প্রথমে এই বিভাগ-প্রণালীর আবিষ্কার করেন, সেই সিদ্ধান্তটি ঠিক বিজ্ঞানসম্মত নহে; কারণ, গণিতজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন যে, বেবিলন দেশের বিভাগপ্রণালিটি সূর্যের দৈনিক গতির সহিত সম্বন্ধ। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, হিন্দুদিগের প্রথম বিভাগটি চন্দ্রের দৈনিক গতির উপর নির্ভর করে এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, বৈজ্ঞানিকগণের মতে চান্দ্রবিভাগ প্রথমে আবিষ্কৃত হয় এবং পরে ক্রমোন্নতির সাধারণ নিয়মানুসারে রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশিতে বিভাগ প্রচলিত হয়। সুতরাং ইহা নিশ্চয় যে, ক্রান্তিবৃত্তের ২৭ নক্ষত্রে বিভাগ হিন্দু জ্যোতিষীদিগেরই কল্পনাসম্ভূত।

বেণ্টলী সাহেব তদ্‌রচিত "হিন্দু জ্যোতিষ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, চীনবাসিগণ তাহাদের তিথিবিভাগের জন্য প্রধানতঃ হিন্দু জ্যোতিষের নিকট ঋণী। কিন্তু উভয় প্রণালীতে বিশেষ পার্থক্য আছে। হিন্দুদিগের তিথিবিভাগ সকলগুলিই সমান এবং প্রত্যেক বিভাগ ক্রান্তিবৃত্তের ১৩⅓ ডিগ্রী; সেই স্থলে চীনদিগের বিভাগগুলি সমান ত নয়ই বরং এত
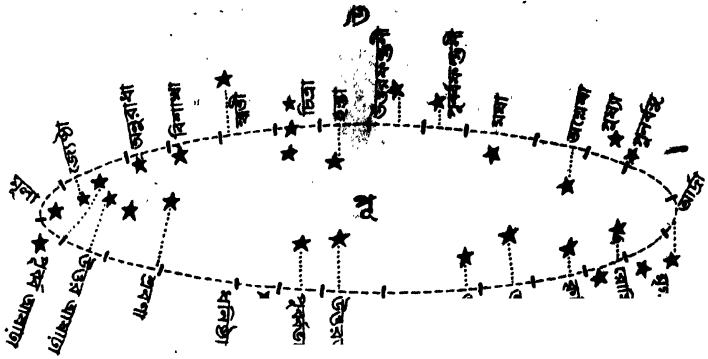
ক্রান্তিবৃত্তের সাতাশটি বিভাগ ও যোগতারা

ছোটবড় যে, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বিভাগ ৩০ ডিগ্রী, এবং সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বিভাগ কয়েক মিনিট মাত্র। তাহাদের প্রত্যেক বিভাগটির আরম্ভ একটি তারকার দ্বারা সূচিত হইয়াছে। বেণ্টলী আরও বলেন যে, আরব জ্যোতিষীগণ চীনাবাসীদিগকে তিথিবিভাগের আভাস দিয়াছেন, কারণ এই দুই দেশের তিথিবিভাগের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ২৮টি বিভাগের মধ্যে ১৩টি একেবারে এক প্রকার ও এক ক্রমানুযায়ী। কিন্তু এই তুলনা হইতে এই প্রশ্নই মনে উদিত হয় যে, চীনা জ্যোতিষীরা আরব জ্যোতিষীদিগের নিকট ঋণী, কিংবা আরব জ্যোতিষীরা চীনা জ্যোতিষীদিগের নিকট ঋণী? আরব পণ্ডিতেরা বলেন যে, চীনা কি আরব জ্যোতিষী কেহ কাহারও কাছে ঋণী নয়। তাঁহারা উভয়েই এক তৃতীয় স্থান হইতে এই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এবং এই তৃতীয় স্থান হিন্দু জ্যোতিষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। গ্রীকদিগের তিথিবিভাগ ছিল

না। তবে কসটার্ড (Costard) তদ্‌রচিত "মিশর জ্যোতিষ" শীর্ষক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, আরবদিগের তিথিবিভাগ মিশর দেশের (Chaldean) জ্যোতিষ হইতে গৃহীত। কিন্তু পূর্বেই দেখা গিয়াছে যে, প্রাচীনতম তিথি বিভাগ হিন্দুদিগের দ্বারা আবিষ্কৃত।

তারপর দেখা যাক, রাশিচক্রের উদ্ভাবন কখন হইয়াছিল। ভারতবর্ষে উহার ব্যবহার কখন হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আমরা যথেষ্ট পাই, কিন্তু ভারতবর্ষেই যে উহার জন্মলাভ হইয়াছিল, তাহা অনুমানসাপেক্ষ। হিন্দুদিগের রাশিচক্রবিভাগ ও মিশর দেশের রাশিচক্রবিভাগের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে বলিয়া কোনও কোনও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, মিশর দেশেই রাশিচক্র বিভাগের উদ্ভব হয়। কোলব্রুক (Colebrooke) সাহেবের ধারণা যে, গ্রীকদিগের নিকট হিন্দু জ্যোতিষীগণ রাশিচক্রবিভাগের জন্য ঋণী।* কিন্তু এ ধারণা একেবারে ভ্রান্ত। আমরা জানি যে, এই রাশিচক্রের বিভাগ Thales প্রভৃতি গ্রীক জ্যোতিষীগণ মিশর দেশ হইতে আনিয়াছিলেন। সুতরাং কোলব্রুক-এর মত বিজ্ঞানসম্মত নহে। মিশর দেশ ও ভারতবর্ষ এই দুই দেশের মধ্যেই যে কোন এক দেশে রাশিচক্রবিভাগের উদ্ভব হইয়াছিল, ইহা স্থির নিশ্চয়। কতকগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া কোলব্রুক স্থির করিয়াছিলেন যে, হিন্দু-জ্যোতিষ, চীন-জ্যোতিষ ও মিশর-জ্যোতিষ একই মূল হইতে সংগৃহীত। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার স্বপক্ষে তিনি কতকগুলি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, হিন্দু, মিশর ও চীন সকলেই সপ্তাহকে সাত দিনে ভাগ করিয়াছেন, দিনগুলির নামেও বেশ সাদৃশ্য আছে ; তাহাদিগের রবিকক্ষার বিভাগটিও

* Colebrooke Essays, vol. II, pp. 343-55,

একরূপ, রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশিতে বিভাগও এক প্রকার, বৎসরের মাস সংখ্যা একরূপ। সর্বশেষে তাহাদের নক্ষত্রমণ্ডলীর সংখ্যাও যেমন একরূপ তেমনি উহাদের কাল্পনিক নামকরণেও বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।

বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের পূর্বকালে ভারতবর্ষে মেষাদি রাশিসংজ্ঞা ব্যবহৃত হয় নাই, কারণ বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে ঐ সংজ্ঞার উল্লেখ নাই। অশ্বিনী নক্ষত্র হইতে মেষাদি রাশি গণনা করা হইয়াছিল। কোনও এক সময়ে অশ্বিনী নক্ষত্রের নিকট বিষুবন্ থাকিত, সেই জন্য অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র হইয়াছিল। অয়নগণনা দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, শকপূর্ব প্রায় ৫০০ বৎসরে অশ্বিনী নক্ষত্রের নিকট বিষুবন্ থাকিত; সুতরাং ভারতবর্ষে মেষাদি রাশি গণনা ঐ সময় হইতে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। আমরা জানি যে, চক্রবিভাগকালের পূর্বে মহাবিষুব কৃত্তিকা নক্ষত্রে অবস্থিত ছিল। কাল গণনা করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে, খ্রীষ্টজন্মের ২৩০০ বৎসর পূর্বে উহা সম্ভব হইয়াছিল। উহারই অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষে 'ভ'চক্রবিভাগ প্রচলিত হয়। কিন্তু তখন যে অয়নচলন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। এমন কি রাশিবিভাগের সমকালে মেষরাশির আদিতে বিষুববিন্দুর সংস্থান-আবিষ্কারের পূর্বে যে হিন্দু জ্যোতিষীদিগের অয়নচলন জ্ঞান হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া কঠিন।

রাশিচক্রবিভাগের প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। হিন্দুজ্যোতির্বিদগণ রাশিচক্রের বিভাগ ধরিয়া সৌর মাস ও বৎসর গণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্বে দেখা গিয়াছে যে, বিষুববিন্দুর একটা গতি আছে, তাহাকে অয়নচলন বলে। সুতরাং রাশিচক্র ধরিয়া মাস ও বৎসর গণনায় অয়নচলন প্রয়োগের আবশ্যকতা হয়। ইহাতে

কিছু কিছু বিপর্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। এই কারণেই ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা রাশিচক্র ধরিয়া বৎসর ও মাস গণনা পরিত্যাগ করিয়া বিষুব হইতে কালগণনা প্রচলন করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের বৎসর, মাস ও ঋতুর মধ্যে অনৈক্য ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প হইলেও রাশিচক্র একেবারে বর্জিত হইয়াছে এবং সৌর মাস রাশি-অনুযায়ী না হইয়া একেবারে অর্থশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুদিগের প্রণালীতে রাশিচক্রের উপযোগিতা রক্ষিত হইয়াছে এবং মাসগণনাতে জ্যোতিষিক সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। অয়নচলন প্রয়োগ করিয়া অল্পায়াসেই রাশিপরিক্রমণের সময় বিশুদ্ধভাবে গণনা ও মাসপরিমাণ নির্ধারণ সম্ভবপর। সুতরাং দেখা যায় যে, রাশিচক্রবিভাগের ব্যবহার হিন্দু জ্যোতিষিগণই বিজ্ঞানসম্মতভাবে করিয়া আসিতেছেন। যাহা হউক, এই রাশিচক্রের বিভাগ জ্যোতিষিক গণনায় এতদূর প্রয়োজনীয় যে, একথা নিঃসন্দেহ, যিনিই এই রাশিচক্রবিভাগের প্রবর্তক হউন না কেন, তিনি যে প্রাচীন জ্যোতিষে একটা উচ্চাঙ্গের কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা অবশ্য স্বীকার্য।

# পৃথিবীর গতি ও আকৃতি

বর্তমান বৈজ্ঞানিক জগতে সুধীমণ্ডলী অভ্রান্ত প্রমাণে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পৃথিবী সচলা ও সূর্য চলচ্ছক্তিবিহীন। পৃথিবী-নিজ ব্যাসের চতুর্দিকে ২৪ ঘণ্টায় একবার স্বীয় পরিধি পরিক্রম করিতেছে,—ইহা তাহার আহ্নিক গতি। আর পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ডে একটি বৃত্তাভাস-পথে ভ্রমণ করিতেছে, উহা তাহার বার্ষিক গতি। ইওরোপে যখন জ্যোতিষের নামগন্ধও ছিল না, গ্যালিলিও ও কোপারনিকস প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভ্যুদয়ের বহু পূর্বে ভারতে আর্যভট পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রমাণ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতে ও ইওরোপে ইহার অনুকূল ও প্রতিকূল কত যুক্তি তর্ক উত্থাপিত হইয়াছিল, কত মনীষী কত প্রকারে ইহার সত্যতা বা অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা জ্যোতিষের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একটি আমোদজনক অথচ শিক্ষাপ্রদ কাহিনী।

প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টাব্দ পঞ্চ শতাব্দীতে আর্যভটের সময় হইতেই ভারতে জ্যোতিষশাস্ত্রের যথার্থ সমাদর আরম্ভ হয়। আর্যভট (৪৭৫ খৃষ্টাব্দ) তদ্‌রচিত 'গীতিকাপাদ' গ্রন্থশেষে বলিতেছেন—"এই নক্ষত্র-পঞ্জর মধ্যে ভূগ্রহচরিত যিনি অবগত হইবেন, তিনি গ্রহভগণ পরিভ্রমণ ভেদ করিয়া পরব্রহ্মে গমন করিবেন।" যাহা হউক, তিনিই প্রথমে দিবারাত্রি ভেদের কারণ স্বরূপ পৃথিবীর গতি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। গীতাকাপাদের প্রথম শ্লোকে তিনি লিখিয়াছেন,—এক চতুর্যুগে (৪৩,২০,০০০ সৌরবর্ষে) পৃথিবীর পূর্বদিকে গতিসম্ভূত ভগণ ১৫৮,২২,৩৭,৫০০ বার—অর্থাৎ অত

সৌরবর্ষে পৃথিবীর অত দিন হয়, সূর্যের নহে। তিনি ইহার পর ভূভ্রমণের নিদর্শন দিতেছেন—

অনুলোমগতি নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্॥

অর্থাৎ অনুলোমগতিযুক্ত ( পূর্বদিকে গতিবিশিষ্ট ) নৌকারূঢ় ব্যক্তি নদীর উভয় পার্শ্বস্থ তটবর্তী অচল বৃক্ষাদি বিলোমগামী ( পশ্চিমগামী ) দেখেন ; তেমনই লঙ্কাতে ( নিরক্ষদেশে ) অচল নক্ষত্রসমূহকে সমবেগে পশ্চিম দিকে যাইতে দেখা যায়।

কিন্তু বহু দিন পর্যন্ত আর্যভটের এই মতবাদ ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ মানিয়া লন নাই। আর্যভটের প্রায় সমসাময়িক জ্যোতির্বিদ বরাহমিহিরই বিরোধী দলের মধ্যে প্রথম ; তিনি "পঞ্চসিদ্ধান্তিকায়" লিখিলেন—

"কেহ কেহ বলেন যে পৃথিবী যেন একটি ঘূর্ণ্যমান ভচক্রে স্থাপিত হইয়া ঘুরিতেছে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে পক্ষী প্রভৃতি আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া কুলায়ে ফিরিয়া আসিতে পারিত না ( সপ্তম অধ্যায়,—৬ শ্লোক )।

"পুনশ্চ, যদি পৃথিবী এক দিনে একটি আবর্তন সম্পূর্ণ করিত, তাহা হইলে পতাকা প্রভৃতি পৃথিবীর আবর্তনের দ্রুততা নিবন্ধন সকল সময়ে পশ্চিম দিকেই ধাবিত হইত। যদি পৃথিবী ধীরে চলিতেছে বলা হয়, তাহা হইলে ২৪ ঘণ্টায় একটি আবর্তন সম্পূর্ণ হয় কিরূপে ( ৭ম শ্লোক ) ?"

এমন কি, আর্যভটের শিষ্য লল্লও গুরুর ভূভ্রমণবাদ খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। লল্ল বরাহমিহিরের সমসাময়িক, ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন। লল্ল লিখিয়াছেন, "যদি পৃথিবী ভ্রমণ

করিতেছে, তবে পক্ষিসমূহ উড়িয়া গিয়া কিরূপে নিজ নিজ নীড়ে প্রত্যাগমন করিতে পারে ? আকাশাভিমুখে প্রক্ষিপ্ত বাণ পশ্চিম দিকে পতিত হইতে দেখা যায় না কেন ? মেঘসমূহকে কেবল পশ্চিম দিকেই গমন করিতে দেখা যায় না কেন ? যদি বল, পৃথিবী মন্দ মন্দ চলিতেছে বলিয়া এ সকল ব্যাপার সম্ভবপর হইতেছে, তাহা হইলে একদিনে উহার কিরূপে একবার আবর্তন ঘটে ?" আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, বরাহ-মিহিরও ঐ প্রকার যুক্তি তুলিয়া পৃথিবীর গতিসম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছিলেন। ব্রহ্মগুপ্ত বরাহমিহিরের পরবর্তী জ্যোতির্বিদ্; তিনি ৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মস্ফুট' সিদ্ধান্ত রচনা করেন। তিনি ও তাঁহার পরবর্তী অনেক জ্যোতির্বিদই আর্যভটের ভূভ্রমণবাদের বিরুদ্ধে বরাহমিহিরের ন্যায় আপত্তি তুলিয়াছিলেন। আশ্চর্যের কথা এই যে, পৃথিবীর সহিত ভূবায়ুরও যে আবর্তন ঘটিতে পারে, ইহা তাঁহাদের কাহারও মনে উদিত হয় নাই। আর্যভটের ভূভ্রমণবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া ব্রহ্মগুপ্ত আর একটি আপত্তি তুলিয়াছিলেন—

"প্রাণেনৈতি কলাং ভূর্যাদি তৎকুতো ব্রজেৎ কমধ্বানম্।
আবর্তনমূর্ব্যাশ্চেন্ন পতন্তি সমুচ্ছ্রায়াঃ কস্মাৎ ॥"

অর্থাৎ যদি এক প্রাণে ( ৬ প্রাণে এক পল ) পৃথিবী এক কলা চলিতেছে, তাহা হইলে উহা কোন্ পথে কোথা হইতে চলিতেছে ? যদি পৃথিবীর আবর্তনই থাকে, তবে সমুচ্ছ্রিত বস্তু পড়ে না কেন ?

তখন পৃথিবীর গতি একটা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এমন কি, আলবেরুণী দশম শতাব্দীতেও লিখিয়াছেন, পৃথিবী সচল হউক বা অচল হউক, উভয় কল্পনাতেই জ্যোতিষিক গণনার ব্যাঘাত হয় না।

বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ভট্টোৎপল বা উৎপল ভট্ট দশম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াও আর্যভটের ভূভ্রমণবাদ স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। তিনি বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্তের যুক্তি মানিয়া লইয়াছিলেন। এমন কি, ভারতীয় বৈজ্ঞানিক-শিরোমণি ভাস্করাচার্যও আর্যভটের মতবাদ অস্বীকার করেন। এই বিষয়ে তিনি তেমন বেশি কিছু আলোচনা করেন নাই। দ্বাদশ শতাব্দীতে গণিত আলোচনা করিতে বসিয়া অনেক জটিল প্রশ্নের সমাধান করিতে উদ্যত হইয়া অপেক্ষাকৃত সরল ভূভ্রমণবাদে তিনি মনোযোগ দেন নাই ; কারণ তিনি জানিতেন, জ্যোতিষগণনায় পৃথিবী অচল হইয়া সূর্য ও নক্ষত্র গতিশীল হইলে, অথবা পৃথিবী সচল হইয়া সূর্য ও নক্ষত্র নিশ্চল থাকিলে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে। ভাস্করাচার্য যে আর্যভটের ভূভ্রমণবাদের বিরোধী ছিলেন, তাহা তদ্‌রচিত সিদ্ধান্তশিরোমণির 'গোলাধ্যায়ে'র প্রথম অধ্যায়ে এ বিষয়ের আলোচনা হইতে এবং আর্যভটের মতবাদের বিরুদ্ধে লল্লের যুক্তির উদ্ধার ও পরিপোষকতা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

উক্ত মতবাদের বিরোধী দল এত প্রবল ছিল যে, আর্যভটের টীকাকার পরমেশ্বর আর্যভটের পূর্বোদ্ধৃত উক্তির এক বিচিত্র ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"পরমার্থতস্তু স্থিরেব ভূমিঃ। ভূমেঃ প্রাগ্‌গমনং নক্ষত্রাণাং গত্যভাবঞ্চেচ্ছন্তি কেচিৎ তন্মিথ্যাজ্ঞান বশাদিত্যাহ" —অর্থাৎ "পৃথিবী বাস্তবিকই স্থির। তবে কেহ কেহ বলেন, পৃথিবীর পূর্ব দিকে গতি আছে এবং নক্ষত্রসমূহ নিশ্চল। তাহা মিথ্যা জ্ঞান।" পরমেশ্বর ভাস্করাচার্যের পরবর্তীকালের জ্যোতিষী। বোধ হয়, সেই সময়ে পৃথিবীর আবর্তন কেহই সাহস করিয়া প্রকাশ করিতে পারিত না। এই জন্যই হয়ত বা পরমেশ্বর আর্যভটের অর্থবিভ্রম ঘটাইয়াছেন।

কিন্তু আর্যভটের মতবাদেরও একজন প্রধান পরিপোষক ছিলেন।

তিনি ব্রহ্মগুপ্তের বিখ্যাত টীকাকার পৃথুদক স্বামী। তিনি আর্যভটের ভূভ্রমণবাদ গ্রাহ্য করিয়া বলেন—

ভূপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রাতিদৈবসিকৌ।
উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাম্॥

অর্থাৎ নক্ষত্রমণ্ডল স্থির রহিয়াছে; কেবল পৃথিবীর আবৃত্তি বা পরিভ্রমণ দ্বারা গ্রহনক্ষত্রগণের প্রাত্যহিক উদয়াস্ত হইতেছে।

পৃথুদক ঐ টীকার অন্য স্থলে ব্রহ্মগুপ্তের আপত্তির খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন: "পৃথিবীর আবর্তন-মতই ঠিক; একই সময়ে গ্রহদিগের দুই প্রকার গতি (পশ্চিম দিকে দৈনিক গতি ও পূর্ব দিকে স্বগতি) হইতে পারে না। আর পৃথিবীর আবর্তন হইলে উচ্চস্থিত বস্তু পড়িবে কেন এবং পড়িবেই-বা কোথায়? কারণ, পৃথিবীর উর্ধ্বও যাহা, অধঃও তাহা। বস্তুত দ্রষ্টার অবস্থিতি অনুসারে উর্ধ্বাধঃ ভেদ হইয়া থাকে।" পৃথূদকের জীবনকাল সম্বন্ধে এইমাত্র জানা যায় যে, তিনি বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ শ্রীপতির পূর্ববর্তী সময়ে জীবিত ছিলেন; যেহেতু শ্রীপতি তাঁহার গ্রন্থে পৃথূদকের মতবাদ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। শ্রীপতি ৯৬২ শকাব্দ অথবা ১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দে 'সিদ্ধান্তশেখর' রচনা করেন। সুতরাং মনে হয়, পৃথূদক দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে স্বীয় মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন।

এই পৃথিবীর গতি বিষয়ে কোলব্রুক সাহেব লিখিয়াছেন: "আর্যভট পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে যে মত প্রথমে প্রবর্তিত করেন, সাত শত বর্ষ পূর্বেও তাহা এ দেশের কেহ কেহ স্বীকার করিতেন। পাশ্চাত্য দেশেও বহুকাল পূর্বে হীরাক্লিদিজ, পাইথাগোরাস ও অপর দুই-এক ব্যক্তি পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে আস্থাবান্ ছিলেন। কিন্তু যেমন পাশ্চাত্য দেশে, তেমনি ভারতে এ মতটি একেবারে পরিত্যক্ত হয়।"

ইওরোপে জ্ঞানোন্নতির পুনরুন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য ভূমিখণ্ড যখন বিজ্ঞানের দীপ্ত কিরণে পুনরায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তখন কোপারনিকস্ নামে প্রুশিয়া দেশীয় এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত টলেমির প্রমাদপূর্ণ ও অনৈসর্গিক মতবাদের খণ্ডন করিয়া এই অভিনব তত্ত্ব প্রচার করিলেন যে : সূর্য স্থির, রাশিচক্রের মধ্যস্থলে অবস্থিত; এবং পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। পাশ্চাত্য জগতে পৃথিবীর গতিবাদ সর্বপ্রথম কোপারনিকসই স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু ইহার পরে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ টাইকোব্রাহি কোপারনিকসের ভূ-ভ্রমণবাদ সম্বন্ধে আপত্তি তুলিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : "যদি পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে আবর্তিত হইতেছে, তবে ঊর্ধ্ব হইতে পতিত লোষ্ট্র পশ্চিম দিকে পড়িতে দেখা যায় না কেন ?" যখন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ টাইকোব্রাহিও কোপারনিকসের ভূ-ভ্রমণবাদের বিরোধী হইয়াছিলেন, যখন খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেও পাশ্চাত্য দেশে কোন কোন জ্যোতিষী এই তর্কের মীমাংসা অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তখন যে ভারতের অতি প্রাচীন জ্যোতিষিবৃন্দের মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হইবে, এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে তাঁহারা যে পৃথিবীর গতি অস্বীকার করিবেন, ইহা তেমন আশ্চর্যের কথা নহে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পৃথিবীর সহিত ভূ-বায়ু যে আবর্তিত হইতে পারে, ইহা তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই। টাইকোব্রাহির আপত্তির খণ্ডনে বলা হইয়াছিল যে, মৃন্ময়ী পৃথিবীর সহিত ভূ-বায়ু ও লোষ্ট্রখণ্ড ভ্রমণ করিতেছে, এজন্য লোষ্ট্রটি ঠিক নিম্নেই পতিত হইবে। কিন্তু ইহা দ্বারা উক্ত আপত্তির খণ্ডন হইল মাত্র, ভূ-ভ্রমণ প্রমাণিত হইল না।

পৃথিবীর নিশ্চলতা সম্বন্ধে টলেমির মতটি— পাশ্চাত্য ভূমিখণ্ডে

সহজ বলিয়াই হউক, অথবা পর্যবেক্ষণের অভাবনিবন্ধনই হউক—এমন দৃঢ়ভাবে সর্বসাধারণের কল্পনারাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছিল যে, ইহার বিরোধী কোনও মতবাদ শুধু যে অগ্রাহ্য ছিল তাহা নহে, ধর্মবিরুদ্ধ মত বলিয়া উহা অশ্রদ্ধেয় ছিল। সেইজন্য যখন গ্যালিলিও তাঁহার নবাবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত করিলেন যে, পৃথিবীই সচল আর সূর্য ও নক্ষত্রসমূহ অচল, তখন তাঁহাকে আপনার মত প্রচার করিতে গিয়া প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছিল। মৃত্যুসময়ে ভূতলে পদাঘাত করিয়া তিনি যে সগর্বে বলিয়াছিলেন "এখনও পৃথিবী চলিতেছে"—সে বাণী আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের ইতিহাস সোনার নিকষ রেখায় লিখিয়া রাখিয়াছে।

পৃথিবীর গতির বিরুদ্ধে আর্যভটের পরবর্তী অন্যান্য জ্যোতির্বিদগণও নানাপ্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন। সেই যুক্তিগুলির স্থূল মর্ম এই—(১) পৃথিবী যদি সচলা হইত এবং কল্পিত ব্যাসের উপর অবস্থিত থাকিয়া ২৪ ঘণ্টায় স্বীয় কক্ষ আবর্তন করিত, তবে এরূপ প্রবলবেগে বিঘূর্ণনের জন্য ধরাতলস্থ অট্টালিকা ও মঠমন্দিরাদি প্রতি মুহূর্তে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হইত সন্দেহ নাই। (২) পৃথিবী অবিরত কম্পিত হওয়ায় মনুষ্য, পশু, প্রাণী, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করা দূরে থাকুক, স্থির হইয়া দাঁড়াইতেও সমর্থ হইত না। (৩) ভূমিকম্পের জন্য প্রবল জলকম্প হওয়ায় নদনদীর স্রোত, জোয়ার-ভাটা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইত। (৪) উচ্চতম পর্বতশিখর হইতে কোন গুরু পদার্থ নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইলে, পর্বতপাদমূলেই নিপতিত হয়; কোথাও এই নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায় না। কিন্তু পৃথিবী গতিশীল হইলে

তাহা সম্ভবপর হইত কি? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অনুসারে পৃথিবীর পরিধি ২৫ হাজার মাইল এবং উহার আহ্নিক গতি, অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্তনের জন্য ঘণ্টায় গতি $\frac{২৫০০০}{২৪}$ মাইল বা এক হাজারের কিছু বেশি সুতরাং মিনিটে ১৬ মাইলেরও কিঞ্চিদধিক। অতএব পর্বতশিখরচ্যুত দ্রব্য ৩০ সেকেণ্ডে যদি ভূমি স্পর্শ করে, তবে সেই সময়ে পৃথিবীর গতিশীলতার নিমিত্ত ঐ পর্বত ৮ মাইল দূরে সরিয়া যাইবার কথা। (৫) এইরূপ পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে কোন স্থূল পদার্থ লক্ষ্য করিয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলেও, পৃথিবীর গতি থাকিলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। এইরূপ আরও অনেক যুক্তি সিদ্ধান্তগ্রন্থগুলিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, যেমন—(৬) পৃথিবীতে সকল সময়ে বৃষ্টিপাত হইতেছে এবং একই স্থানে দুই তিন ঘণ্টা পর্যন্ত বারিধারা পতিত হইতেও দেখা যায়। পৃথিবী সচলা হইলে এই নিয়মের ব্যভিচার হইত। কারণ, এক মিনিটে পৃথিবীর গতি ১৬ মাইলের অপেক্ষাও অধিক; তাহাতে নির্দিষ্ট একই স্থানে দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া বারিবর্ষণ হওয়া এক প্রকার অসম্ভব, যেহেতু কোনও স্থানে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইলে ঐ সময়ের মধ্যে সেই স্থানটি অনেক দূরে সরিয়া যাইবার কথা। মোটকথা, এরূপ ব্যাপার কল্পনার অতীত! (৭) পৃথিবী যদি গতিশীলা বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে আকাশমার্গে উড্ডীয়মান পক্ষিসকল—যাহারা নিজ নিজ কুলায় পরিত্যাগ করিয়া বিমানপথে বিচরণ করে—ফিরিয়া কখনও নিজেদের নীড় খুঁজিয়া পাইত না। কারণ, যে বৃক্ষে তাহাদের কুলায় নির্মিত ছিল, ফিরিয়া আসিবার সময়ে উহা অনেক দূর সরিয়া যাইবে নিশ্চয়ই। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে, ঠিক ২৪ ঘণ্টার পর বৃক্ষটি পূর্ব স্থানেই

আসিয়া পৌঁছিবে এবং পাখিটির পক্ষেও ফিরিয়া আবাসস্থল খুঁজিয়া লইতে কোনও কষ্ট হইবে না।

এইরূপ অনেক কূট তর্কের অবতারণা করিয়া হিন্দুসিদ্ধান্তগুলি আর্যভটের ভূভ্রমণবাদ খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। বাস্তবিক এই তর্কগুলি যে কুশাগ্রবুদ্ধির পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। উহাদের সম্যক্ উত্তর দিতেও বিশেষ গণিতজ্ঞানের প্রয়োজন হয়। বিহঙ্গের কুলায়-প্রাপ্তি সম্বন্ধে মীমাংসার জন্য টীকাকার একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। যদি স্রোতের জলে পিপীলিকা সন্তরণ করিতে আরম্ভ করে, তবে স্রোতের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার গতি হওয়া নিশ্চিত। সেইরূপ আকাশ-মার্গে সঞ্চরমাণ বিহঙ্গও পৃথিবীর গতির অনুকূল দিকেই ধাবিত হইয়া থাকে। স্রোতোবেগের তুলনায় পিপীলিকার বেগ যত সামান্য, পৃথিবীর বেগবলের তুলনায় পাখির বেগবল তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ অল্প। সুতরাং পিপীলিকা যদি স্রোতের বিপরীত দিকে গমনে সমর্থ না হয়, তবে পৃথিবীর প্রবল বেগকে পরাভূত করিয়া ক্ষীণবেগশালী পাখি কিরূপে প্রতিকূলমুখে গমন করিবে?

আসল কথা, এই যে এত গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার একমাত্র কারণ 'অপেক্ষিক গতিতত্ত্ব' (Law of relative velocity) সম্বন্ধে অজ্ঞতা। বোধ হয়, সে সময়ে গণিতে 'আপেক্ষিক গতিতত্ত্ব' বিষয়টি আবিষ্কৃত হয় নাই; হইলে সহজেই এই গোল মিটিয়া যাইতে পারিত। কারণ আমরা জানি, পৃথিবীর সহিত অনন্ত বায়ুমণ্ডলও সমান বেগে পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। সেইজন্য পাখি যখন কুলায় পরিত্যাগ করিল, তখন উহার গতিবেগ পৃথিবীর বেগবল ও নিজের বেগবলের সমষ্টি। সুতরাং পৃথিবীর সঙ্গে

আপেক্ষিক ভাবে ( অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলকে নিশ্চল অবস্থায় আনিতে হইলে, পূর্বোক্ত পাখির গতিবেগ হইতে বায়ুর গতিবেগ বাদ যাইবে ) পাখির বেগবলই একমাত্র গতির পরিচালক হইবে। কারণ, সমস্ত ব্যাপারটিই পৃথিবীর সঙ্গে আপেক্ষিক ভাবে হইতেছে ; এবং এই যে কুলায়-প্রাপ্তি ইহাও পৃথিবীর সহিত আপেক্ষিক ভাবে সংশ্লিষ্ট।

পৃথিবীর এই গতিসমস্যা পাশ্চাত্য দেশেও অনেক জটিল আলোচনার সৃষ্টি করিয়াছিল। টাইকোব্রাহির মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান শিষ্য কেপ্‌লার যখন অধ্যাপকের অগাধ পর্যবেক্ষণলব্ধ গবেষণার উত্তরাধিকারী হইয়া, প্রাচীন নীচোচ্চ বৃত্ত-পদ্ধতির সাহায্যে গ্রহগণের গতিবিষয়ে নূতন তথ্যের উদ্ভাবন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন তিনি পৃথিবী গতিহীন এই মত অবলম্বন করিয়া বিশেষ সফলতালাভ করিতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি পৃথিবীর নিশ্চলতা সম্বন্ধে মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্তে পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন।

বর্তমান জ্যোতিষশাস্ত্রে পৃথিবীর এই গতিসম্বন্ধে অনেক প্রমাণ ও পরীক্ষা ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া দিয়াছে ; উহাদের মধ্যে ফুকোর ( Foucault ) দোলক-পরীক্ষা এবং নিউটনের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রমাণ—এই দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে ফুকোর পরীক্ষায় এমন কতকগুলি ধারণা মানিয়া লওয়া হইয়াছে, যাহা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের অতীত। নিউটনের প্রমাণটিই সহজে বোধগম্য বলিয়া সর্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য। সেটি এই—কোনও প্রাসাদশিখর হইতে একটি গুরুভার দ্রব্য ভূমিতে ফেলিয়া দিলে আমরা দেখিতে পাই, দ্রব্যটি ঠিক প্রাসাদের পাদমূলে না পড়িয়া পূর্ব দিকে কিছু সরিয়া গিয়া পড়িয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ভ্রমণ করিতেছে।

পৃথিবীর আবর্তনের কারণ সম্বন্ধে ভট্টোৎপলের উদ্ধৃত শ্লোক হইতে ইহা জানিতে পারা যায় যে, আর্যভট নিজ কক্ষের চতুর্দিকে পৃথিবীর আবর্তনের কারণ বলিয়া পৃথিবীর উপরিভাগে প্রবহমান প্রবহবায়ুকে ( current of aerial fluid ) নির্দেশ করিয়াছিলেন। পৃথিবীর আবর্তনের কারণ বলিয়াই হউক; অথবা ভচক্রের ( নক্ষত্রপুঞ্জের ) আবর্তনের কারণ বলিয়াই হউক, বরাহমিহির প্রভৃতি সকল জ্যোতির্বিদই প্রবহবায়ুকেই আবর্তনের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ উভয় দলই আবর্তনের কারণ সম্বন্ধে একমত।

এক্ষণে দেখা যাউক, আর্যভটের পূর্ববর্তী জ্যোতির্বিদ্‌গণের এ বিষয়ে কি মতামত ছিল। ভট্টোৎপলের উদ্ধৃত বচন হইতে জানিতে পারা যায় যে, 'পৌলিশ সিদ্ধান্ত' মতে পৃথিবী গোলাকার এবং আবর্তনশীল ভচক্রের কেন্দ্রে নিশ্চল ভাবে অবস্থিত ; আর ঐ আবর্তনের কারণ প্রবহবায়ুর চালনাশক্তি। 'বশিষ্ঠসিদ্ধান্তে'ও উক্ত মতই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভট্টোৎপল তদ্‌রচিত 'বৃহৎ সংহিতা'র টীকায় উক্ত মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ বিষয়ে জৈন জ্যোতিষীদিগের অদ্ভুত মতামত ছিল। এ স্থলে আমরা উহাদের আলোচনা করিব না।

এখানে উল্লেখ করা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের* এক স্থানে দিবারাত্রি ঘটনার কারণসম্বন্ধে একটি কথা আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের রচনার কাল কোপারনিকসের জন্মের অন্ততঃ দু'হাজার বৎসর পূর্বে। তাহার অনুবাদ এই : "রাত্রি অবসান হইলে প্রাতঃকালে যখন লোকে মনে করে সূর্য উদিত হইলেন, বাস্তবিক তখন সূর্য আপনাকেই

* ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৩য় পঞ্চিকা, ৪৪ অধ্যায়

বিপর্যস্ত করেন। দিবাবসানে লোকে যখন মনে করে সূর্য অস্তগত হইলেন, বাস্তবিক তখন সূর্য বিপর্যস্ত হইলেন ; সূর্যের সম্মুখ ভাগে দিবা এবং বিপরীত ভাগে রাত্রি হয়। বস্তুতঃ 'স বা এষ ন কদাচনস্তমেতি নোদেতি'। সূর্যের অস্তও নাই, উদয়ও নাই।

ডাঃ হৌগ (Dr. Haug) প্রথমে এই অংশটির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি এই টিপ্পনী করিয়াছিলেন : "This passage is of considerable interest, containing the denial of the existence of sun-rise and sun-set. The author ascribes a daily course to the sun, but supposes it to remain always in its high position on the sky, making sun-rise and sun-set by means of its own contrarieties." এ সম্বন্ধে মনিয়র উইলিয়মস্ সাহেব ( Monier Williams ) তদ্রচিত 'Indian wisdom' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"We may close the subject of the Brahmanas by paying a tribute of respect to the acuteness of the Hindu mind, which seems to have made some shrewd astronomical guesses more than 2000 years before the birth of Copernicus." অর্থাৎ মনিয়র উইলিয়মস্ সাহেব মনে করেন, এ স্থলে পৃথিবীর আবর্তন হেতু দিবারাত্রি হইতেছে, এই কথাই বলা হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে ( ২ অংশ, ৮ অধ্যায়ে ) ঠিক ঐ ভাবের কয়েকটি শ্লোক আছে, যথা :

> যৈ র্যত্র দৃশ্যতে ভাস্বান্ তেষামুদয়ঃ স্মৃতঃ।
> তিরোভাবঞ্চ যত্রৈতি তত্রৈবাস্তমনং রবেঃ ॥ ১৪ ।

নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সর্বদা সতঃ।
উদয়াস্তমনাখ্যং হি দর্শনাদর্শনং রবেঃ॥ ১৫।

অর্থাৎ পৃথিবীর যেখান হইতে সূর্য দৃশ্য হন, সেখানের পক্ষে তাঁহার উদয় এবং যেখান হইতে তিনি দৃশ্য হন না, সেখানের পক্ষে তাঁহার অস্তমন মনে হয়। বাস্তবিক, সূর্যের উদয় বা অস্তমন নাই। তিনি সর্বদা আছেন, কেবল তাঁহার দর্শন ও অদর্শনকে উদয় এবং অস্তমন বলা হয়।

এইবার আমরা পৃথিবীর আকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বহু প্রাচীন কাল হইতে আর্যগণ পৃথিবীকে গোলাকার বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। ঋগ্বেদেই এই বিশ্বাসের অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। সূর্যের সম্মুখে উষাগণ অবস্থিত থাকেন, সূর্যের উদয়াস্ত নাই, ইত্যাদি উক্তি পৃথিবীর গোলত্ব অস্বীকৃত হইলে ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

বর্তমান কালে ভূগোল-গ্রন্থে বলা হইয়া থাকে, নদীতে যখন জাহাজ সম্মুখদিকে অগ্রসর হয়, তখন দূর হইতে সর্বপ্রথম উহার মাস্তুল দেখা যায়, এই কারণে পৃথিবী গোলাকার। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পাশ্চাত্য জ্যোতিষকে অনেক আলোচনার ভিতর দিয়া আসিতে হইয়াছিল। সেইরূপ ভারতেও পৃথিবীর আকৃতি লইয়া যে বহু আলোচনা হইয়াছিল, তাহার ধারা যেমন কৌতূহলজনক, তেমনি শিক্ষাপ্রদ।

পৃথিবীর আকৃতি সম্বন্ধে আর্যভট বলিয়াছেন—

যদ্বৎ কদম্বপুষ্পগ্রন্থিঃ প্রচিতঃ সমন্ততঃ কুসুমৈঃ।
তদ্বদ্ধি সর্বসত্ত্বৈর্জলজৈঃ স্থলজৈশ্চ ভূগোলঃ॥

অর্থাৎ চতুর্দিকে স্থলজ ও জলজ জন্তু দ্বারা পরিবৃত পৃথিবী কদম্ব পুষ্পের ন্যায় গোলাকার। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকায়' বরাহমিহির লিখিয়াছেন:

পঞ্চমহাভূতময়স্তারাগণপঞ্জরে মহীগোলঃ।
খেঽয়স্কান্তান্তঃস্থো লোহ ইবাবস্থিতো বৃত্তঃ ॥
তরুনগনগরারামসরিৎ সমুদ্রাদিভিশ্চিতঃ সর্বঃ।
বিবুধনিলয়ঃ সুমেরুস্তন্মধ্যেঽধঃস্থিতা দৈত্যাঃ ॥

অর্থাৎ যেমন দুই অয়স্কান্তের মধ্যবর্তী গোলাকার লৌহ অবস্থিত থাকে, তেমনই এই মৃত্তিকাদি পঞ্চমহাভূতময় ভূগোল তারাগণমধ্যে শূন্যে বর্তুলাকারে অবস্থিত। ইহার সমুদয় পৃষ্ঠভাগ বৃক্ষ, পর্বত, নগর, উপবন, নদী-সমুদ্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত। ইহার উপরে ও মধ্যভাগে দেবগণের স্থান স্বরূপ সুমেরু এবং অধোভাগে দৈত্যগণ অবস্থিত।

'গোলাধ্যায়ে'র তৃতীয় অধ্যায়ে ভাস্করাচার্য এই ভাবই অন্য প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন—

নান্যাধারঃ স্বশক্ত্যৈব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে।
নিষ্ঠং বিশ্বং চ শশ্বৎ সদনুজমনুজাদিত্যদৈত্যং সমন্তাৎ ॥ ২।

অর্থাৎ, এই ভূপিণ্ডের কোনও আধার নাই, নিজের শক্তিতে আকাশে দৃঢ়রূপে অবস্থিত রহিয়াছে। ইহার পৃষ্ঠে সমুদয় চরাচর, বিশ্বদানব, মানব, দেব, দৈত্য বাস করিতেছে। পক্ষান্তরে, পুরাণে যে পৃথিবীর আধারপরম্পরা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে ভাস্কর বলিয়াছেন—

মূর্তো ধর্তা চেদ্ ধরিত্র্যাস্ততোঽন্য
স্তস্যাপ্যন্যোহ স্যৈবমত্রানবস্থা। ৩
অন্ত্যে কল্প্যা চেৎ স্বশক্তিঃ কিমাদ্যে
কিং ন ভূমেঃ সাষ্টমূর্তেশ্চ ভূমিঃ ॥ ৪

অর্থাৎ, যদি এই পৃথিবীর কোনও মূর্তিবিশিষ্ট বস্তু বা প্রাণীরূপ আধার থাকিত, তাহা হইলে তাহার একটি আধার, আবার সেই আধারের একটি

আধার আবশ্যক হইত। সুতরাং এই অনুমানে অনবস্থা দোষ ( যাহার শেষ নাই ) হইতেছে। যদি বলো আধারের শেষ আছে, তবে সেই শেষের আধারটি নিজের শক্তিতে স্থির আছে, বলিতে হইবে। সেই আধারটিই যদি স্বশক্তিতে স্থির থাকিতে পারে, তবে পৃথিবী পারিবে না কেন? না পারিবার কারণ নাই। যেহেতু, পুরাণাদিতে পৃথিবী অষ্টমূর্তি শিবের এক মূর্তি নহে কি?

পুরাণে বর্ণিত আছে যে অনন্ত নামক নাগরাজ পৃথিবীকে ধরিয়া আছে। অনন্ত নাম হইতেই পৃথিবীর শূন্যে অবস্থিতি বুঝাইতেছে; যেহেতু অনন্ত অর্থে শূন্য। কিন্তু পৃথিবীর নিজের কি শক্তি থাকিতে পারে? সে সম্বন্ধে ভাস্কর বলিতেছেন: "যেমন সূর্য ও অগ্নির ধর্ম উষ্ণতা, চন্দ্রের শীতলতা, জলের দ্রবতা, প্রস্তরের কঠিনতা, বায়ুর চঞ্চলতা, তেমনি পৃথিবীর স্বভাব অচলতা। ফলতঃ বস্তুসমূহের শক্তি বিচিত্র।"

পৃথিবী যদি শূন্যেই অবস্থিত, তবে নীচে পড়িয়া যাইতেছে না কেন? ইহার উত্তরে ভাস্কর বলিতেছেন—"পৃথিবীর আকর্ষণশক্তিবশতঃ শূন্যস্থিত গুরু বস্তু পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয়। তখন আমরা মনে করি, যেন বস্তুটি পড়িতেছে; বাস্তবিক তাহা পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছে। পৃথিবীর চারিদিকেই সমান আকাশ, উহা কোথায় পড়িবে? পৃথিবীর যেখানেই যিনি থাকুন, তিনি তাঁহাকে তলস্থ এবং আপনাকে তাহার উপরে স্থিত মনে করেন। পৃথিবীর ব্যাসের দুই প্রান্তে দুই মনুষ্য নদীতীরে দণ্ডায়মান পুরুষ ও ছায়ার ন্যায় অধঃশিরস্ক থাকেন। আমরা এখানে যেমন দাঁড়াইয়া আছি, অধঃস্থিত মনুষ্যেরাও তেমনই অনাকুলভাবে স্থির আছেন।"

পৃথিবী দর্পণের পৃষ্ঠভাগের মত সমান বলিয়া পুরাণে বর্ণিত আছে। ভাস্কর জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সমান, তবে

দূরবর্তী উচ্চ প্রদেশে রবিকে ভ্রমণ করিতে মানুষ দেখে না কেন? পুরাণকারগণ বলেন যে, মেরুপর্বত পৃথিবীর উত্তর দিকে অবস্থিত এবং সূর্য তাহাকে প্রত্যহ প্রদক্ষিণ করিতেছে। যদি তাই হয়, তবে কিরূপে সূর্যকে দক্ষিণ দিকে যাইতে দেখি?"

পৃথিবীর গোলাকারত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন হয়—পৃথিবী যদি গোলাকার, তবে আমরা সেই প্রকার দেখিতে পাই না কেন? ভাস্কর বলিতেছেন :

"সমো যতঃ স্যাৎ পরিধেঃ শতাংশঃ
পৃথ্বী চ পৃথ্বী নিতরাং তনীয়ান্।
নরশ্চ তৎপৃষ্ঠগতস্য কৃৎস্না
সমেব তস্য প্রতিভাত্যতঃ সা॥"

অর্থাৎ যেমন পরিধির শতভাগ (ক্ষুদ্রাংশ) সমান বোধ হয়, বক্র বোধ হয় না, তেমনই পৃথিবী অত্যন্ত বৃহৎ এবং তাহার তুলনায় মানুষ অতিশয় ক্ষুদ্র বলিয়া পৃথিবীর যতটুকু এক কালে দৃষ্ট হয়, ততটুকু সমান বোধ হয়।

পৃথিবীর গতি ও আকৃতি সম্বন্ধে যত প্রকার আলোচনা হইয়াছিল, তাহাদের একটা ধারা বিবৃত হইল মাত্র। হইতে পারে, ইহাদের মধ্যে কতক মন্তব্য ভ্রান্ত, কতক অদ্ভুত; কিন্তু তাহা হইলেও এই আলোচনার ধারা লক্ষ্য করিলে মনে হয় না কি যে, এবিষয়ে প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌গণ যে অনুসন্ধিৎসা ও পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই শিক্ষাপ্রদ ও প্রশংসনীয়?

# হিন্দুদিগের ঋতুবিভাগ ও বর্ষারম্ভ

পাশ্চাত্য জ্যোতিষশাস্ত্রানুসারে বৎসরের চারিটি ঋতুবিভাগ। ২১ মার্চ হইতে ২১ জুন পর্যন্ত তিন মাস কাল বসন্ত, ২১ জুন হইতে ২৩ সেপ্টেম্বর এই তিন মাস কাল গ্রীষ্ম, ২৩ সেপ্টেম্বর হইতে ২১ ডিসেম্বর এই তিন মাস কাল হেমন্ত, এবং ২১ ডিসেম্বর হইতে ২১ মার্চ তিন মাস কাল শীত। কিন্তু ভারতের ঋতুবিভাগ চারিটি নয়, ছয়টি ; গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত।

সূর্যই ঋতুবিভাগের কর্তা, কারণ সূর্যের বার্ষিক গতির ফলস্বরূপ বৎসরের এই ঋতুবিভাগ। ঋগ্‌বেদে এই কথাই বলা হইয়াছে,—"সূর্য ও চন্দ্র উহাদের নিজের শক্তিতে ভ্রমণ করিতেছে, একটি আর-একটির পশ্চাতে, যেন ক্রীড়াপরায়ণ দুইটি শিশু যজ্ঞের চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একটি সমগ্র জগতের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছে, অপরটি ঋতুবিভাগ নির্ণয় করিয়া পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইতেছে।"

ঋতুর সংখ্যা যে ছয়টি, তাহা ঋগ্‌বেদের বহু স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে ; এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় উহাদের নামেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু কোন কোন স্থলে বলা হইয়াছে যে ঋতুর সংখ্যা পাঁচটি, এই স্থলে হেমন্ত ও শিশির (শীত) এই দুই ঋতুকে একই ঋতু ধরিয়া লওয়া হইয়াছে ; ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই কথারই উল্লেখ আছে,—"পাঁচটি ঋতু বলা যাইতে পারে, কারণ হেমন্ত ও শিশির একই ঋতু বলিলে চলে।" মাধবাচার্য প্রণীত কালমাধব পুস্তকের ঋতুনির্ণয় অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যে তৈত্তিরীয় সংহিতা, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণের কোন কোন

স্থলে হেমন্ত ও শিশিরকে একই ঋতু ধরিয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছে। যাহা হউক, ছয়টি ঋতুবিভাগই সাধারণ বিধি ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে এই কথাই বলা হইয়াছে এবং ছয় ঋতুর মাসগুলির এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে—মধু ও মাধব বসন্ত মাস, এই সময়ে তরু ও বৃক্ষ পুষ্প ও ফলে ভূষিত হইয়া উঠে; শুক্র ও শুচি গ্রীষ্ম ঋতুর মাস, এই সময়ে সূর্যের কিরণ উজ্জ্বল ও প্রখর হয় (শুক্র—পরিষ্কার, শুচি—উজ্জ্বল); নভস্ ও নভস্য বর্ষা ঋতুর মাস (নভস্—মেঘ); ঈষ ও উর্জ শরৎ ঋতুর মাস, এই সময়ে খাদ্য (ধান্যাদি) পরিপকতা লাভ করে (উর্জ—খাদ্য); সহস্ ও সহস্য শীত ঋতুর মাস, কারণ শীত ঋতু সকল প্রাণীকে নিজ শক্তির বশীভূত করে; তপস্ ও তপস্য হেমন্ত ঋতুর মাস, এই সময়ে দ্রব্যাদি জমিয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণের আর এক স্থলে মাসগুলির অন্যরূপ নাম দেওয়া হইয়াছে;—রথগৃৎস ও রথৌজস্ বসন্ত ঋতুর মাস, রথস্বন ও রথেচিত্র গ্রীষ্মঋতুর মাস, রথপ্রোত ও অসমর্থ বর্ষা ঋতুর মাস, তার্ক্ষ্য ও অরিষ্টনেমি শরৎ ঋতুর মাস, সেনজিৎ ও সুষেণ শীত ঋতুর মাস, তপস্ ও তপস্য হেমন্ত ঋতুর মাস। শতপথ ব্রাহ্মণে আবার কয়েক স্থলে পাঁচটি ঋতুর উল্লেখ আছে। এই গণনায় হেমন্ত ঋতুর উল্লেখ নাই। এক স্থলে কেবল তিনটি ঋতুর কথা বলা হইয়াছে, সম্ভবতঃ এই গণনায় প্রত্যেক ঋতুর চারিটি মাস ধরা হইয়াছে। এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে শতপথ ব্রাহ্মণের এক স্থানে সাতটি ঋতুর কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু কোথায়ও ইহার সন্তোষজনক কারণ দেওয়া হয় নাই। একস্থলে একটা অস্পষ্ট কারণের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু পরিশেষে বলা হইয়াছে, "বাস্তবপক্ষে ছয়টি ঋতুই ধরা যাইতে পারে।" অপর এক স্থলে আর একরূপ ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা হইয়াছে, প্রথমে বসন্ত প্রমুখ ছয়টি ঋতুর বর্ণনা করা হইয়াছে এবং তৎপরে বলা

হইয়াছে যে ত্রয়োদশ মাস অর্থাৎ মলমাসের রাত্রি ও দিনগুলিকে একটি ঋতু ধরিয়া উহাকে সপ্তম ঋতু বলা যাইতে পারে।

যাহা হউক, মধু ও মাধব প্রভৃতি মাসের নাম বহু বৎসর প্রচলিত ছিল, পরে উহারা চৈত্র, বৈশাখ প্রভৃতি নামে পরিচিত হয়। কখন এই পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল ? বসন্ত তখন ঋতুসমূহের মুখ বলিয়া গণ্য হইত, সুতরাং বসন্ত ঋতু যখন চৈত্র মাসে আরম্ভ হইল, তখন হইতে মাসের নাম পরিবর্তিত হইল। চৈত্র ও বৈশাখ যে বসন্ত ঋতুর মাস ছিল, তাহা পুরাণেও উল্লিখিত আছে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে জ্যোতিষসিদ্ধান্তে ফাল্গুন ও চৈত্র বসন্ত ঋতুর মাস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যের কোথায়ও বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠকে বসন্ত ঋতুর মাস বলা হয় নাই, অথবা চৈত্রও হেমন্ত ঋতুর মাস বলিয়া গণ্য হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে পূর্বে চৈত্র ও বৈশাখকে বসন্ত ঋতুর মাস ধরা হইত এবং আরও পূর্ববর্তী সময়ে চৈত্র বৈশাখ মাস দুইটি মধু ও মাধব নামে পরিচিত ছিল। বর্তমান সময়ের হিন্দু-পঞ্জিকায় ফাল্গুন ও চৈত্র বসন্ত ঋতুর মাস বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে যে বসন্ত ঋতু অয়নচলনের জন্য এতটা সরিয়া আসিয়াছে এবং জ্যোতিষিক গণনায় বলা যায় যে ইহা প্রায় ৪৩০০ বৎসরে সম্ভব হইতে পারে। কাজেই চৈত্র, বৈশাখ নামগুলি শকাব্দ আরম্ভ হইবার প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে প্রচলিত হইয়াছিল। সেই সময়ে বসন্ত ঋতুকেই প্রথম ঋতু বলিয়া গণ্য করা হইত এবং অগ্রায়ণেষ্টি বা অর্ধবাৎসরিক যজ্ঞ প্রভৃতি বসন্ত ঋতুতেই আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা ছিল। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বসন্তকে ঋতুচক্রের মুখ বলা হইয়াছে এবং এই সম্বন্ধে কালমাধব গ্রন্থে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে,—"সংবৎসরোপক্রমরূপত্বেন বসন্তস্য প্রাথম্যং দ্রষ্টব্যম্"—অর্থাৎ বৎসরের রূপ বর্ণনায় বসন্তঋতুই প্রথম।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ফাল্গুনী পূর্ণমসী বৎসরের মুখ বলিয়া গণ্য হইত। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বৎসরকে একটি বিহঙ্গের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, বসন্ত উহার মস্তক, গ্রীষ্ম দক্ষিণ পক্ষ, বর্ষা উহার পুচ্ছ, শরৎ বাম পক্ষ এবং হেমন্ত উহার মধ্যম ভাগ। এই স্থলে শীত ঋতুর উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ শীত ঋতুকে হেমন্তের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে তৈত্তিরীয় সংহিতায় চিত্রা ও ফাল্গুনী পূর্ণমসী হইতে বর্ষারম্ভ ধরা হইয়াছে। সায়ণাচার্য মনে করিয়াছিলেন যে ঋতুবিভাগের প্রথম ঋতু অর্থাৎ বসন্তে চিত্রা ও ফাল্গুনী পূর্ণমসী পড়ে বলিয়াই সেই সময় হইতে বর্ষারম্ভ গণ্য হইয়াছে, তৈত্তিরীয় সংহিতার টীকায় সায়ণ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিলক এই ব্যাখ্যাকে আদৌ সন্তোষজনক মনে করেন নাই, তিনি তদ্‌রচিত Orion গ্রন্থের এক স্থানে বলিয়াছেন,—"সমস্ত জ্যোতিষগ্রন্থের নির্দেশ অনুসারে শিশির আরম্ভ হইত মকর-সংক্রান্তি হইতে এবং সেই সময়ে উত্তরায়ণ-বলিতে যাহা বুঝাইত, তাহাতেই শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম এই তিন ঋতু আসিত। তৈত্তিরীয় সংহিতার সময়ে মকর-সংক্রান্তি মাঘ মাসে পড়িত, সুতরাং মাঘ ও ফাল্গুন মাস ছিল শিশির ঋতু এবং চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত ঋতুর মাস। কিন্তু সায়ণের সিদ্ধান্ত ঠিক হইলে, ফাল্গুন বসন্ত ঋতুর মাস হইয়া পড়ে, অথচ বাস্তবিক তাহা ছিল না।" সায়ণ এই অসামঞ্জস্য বুঝিয়াই বৌধায়ন সূত্রের টীকার এক স্থলে ইহার অন্য ব্যাখ্যা দিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে তিনি চান্দ্র ও সৌর দুই প্রকারের বসন্ত ঋতু ধরিয়াছেন এবং বলিতেছেন যে ফাল্গুন ও চৈত্র চান্দ্র বসন্ত ঋতুর মাস আর চৈত্র ও বৈশাখ সৌর বসন্ত ঋতুর মাস; এই প্রসঙ্গে তিনি ঋগ্‌বেদ হইতে একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে ঋতুবিভাগ চন্দ্রের

দ্বারাই সংগঠিত হইত। ঋতুসমূহের দ্বৈতরূপ সম্বন্ধে সায়ণের মতবাদ তিলক তাঁহার Orion গ্রন্থে এইরূপ ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন— "অবশ্য চান্দ্র মাসের প্রচলন ছিল, কিন্তু চান্দ্র বৎসর ও সৌর বৎসরের আরম্ভ এক সময়েই করিবার জন্য যখনই প্রয়োজন হইত তখনই মলমাস বা অধিমাসের প্রবর্তন হইত, সুতরাং এই ব্যবস্থানুসারে চান্দ্র ঋতুর কোনও স্থানই হইতে পারে না; যখনই ঋতুবিভাগের সহিত চান্দ্র মাসের অসামঞ্জস্য দেখা যাইত, তখনই অধিমাসের প্রবর্তনে সেই অসামঞ্জস্য বিদূরিত হইত।" তিলকের এই যুক্তি ব্যতীত সায়ণের মতবাদের বিরুদ্ধে আরও যুক্তি রহিয়াছে। চান্দ্র বৎসর সৌর বৎসর হইতে ১১ দিন কম, কাজেই সৌর বসন্ত যদি এক বৎসর চান্দ্র চৈত্র মাসের প্রথম দিনে পড়ে, তাহা হইলে পর বৎসর ইহা চান্দ্র চৈত্র মাসের ১২ই তারিখে পড়িবে, আবার পর বৎসর ইহা আরও ১১ দিন সরিয়া যাইবে, এই সব সময়ে অধিমাস যোগ দিয়া বসন্তের আরম্ভকে আবার ১লা চৈত্রে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। সুতরাং ঋতুসমূহের দ্বৈতরূপ বসন্তের আরম্ভকে চান্দ্র বৈশাখে নিয়া ফেলিবে এবং ঐ ঋতুকে আগাইয়া আগাইয়া উহাকে পুনরায় ফাল্গুনে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইবে না। অবশ্য চতুর্দশ শতাব্দীতে যখন সায়ণ জীবিত ছিলেন, বসন্ত ঋতু এখনকার ন্যায় ফাল্গুনেই আরম্ভ হইত, কিন্তু ইহা অয়নগতির জন্যই সম্ভব হইয়াছিল, কারণ সেই সময়ে মকর-সংক্রান্তি এক মাসের উপর পিছাইয়া আসিয়াছিল। জ্যোতির্বিকগণনায় পারদর্শী না থাকায় ইহা সায়ণ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, কাজেই ঋতুসমূহের দ্বৈতরূপ অনুমান করিয়া তিনি ব্যাখ্যা দিতে অগ্রসর হইয়া যে অসামঞ্জস্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহারই পক্ষে যুক্তি দিবার জন্য তিনি কয়েকটি অসম্ভব মতবাদের প্রচার করিলেন। অথচ ভারতীয় সাহিত্যের বহুস্থলে ফাল্গুন

মাসের পূর্ণিমসী রাত্রিকে বৎসরের প্রথম রাত্রি ধরা হইয়াছে। ইহাতেও মনে হয় সায়ণের মতবাদ ভ্রান্ত।

বৈদিক যুগে বর্ষারম্ভ হইত বিষুব-সংক্রান্তি হইতে, সেই সময়ে সূর্য বিষুবরেখার দক্ষিণ হইতে উপরে উঠিত এবং ইহাই ছিল সূর্যের উত্তরায়ণের আরম্ভ। এক কথায় উত্তরায়ণ, বসন্ত ঋতু, বর্ষ ও যজ্ঞ সবগুলিরই একত্র আরম্ভ হইত। পরবর্তী কালে বর্ষারম্ভের সময় বিষুব-সংক্রান্তি হইতে মকর-সংক্রান্তিতে পরিবর্তন করা হইয়াছিল। কিন্তু কোন্ সময়ে এই পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। তবে ইহা নিশ্চিত যে বিষুব-সংক্রান্তি যখন কৃত্তিকানক্ষত্রে ধরা হইত, তাহার বহু পূর্বেই এই পরিবর্তন প্রচলিত হইয়াছিল; এবং যখন এই পরিবর্তন সাধিত হইল, তখন উত্তরায়ণ ক্রমশঃ নূতন বর্ষের প্রথম ভাগ সূচিত করিতে লাগিল, অর্থাৎ মকরক্রান্তি হইতে কর্কটক্রান্তি পর্যন্ত কাল ইহার দ্বারা নির্দিষ্ট হইতে লাগিল। সেই সময়ে বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ মকরক্রান্তি হইতে বর্ষারম্ভ স্থির করিল। শ্রৌতসূত্রেরও স্থানে স্থানে নির্দেশ আছে যে গবাময়ন প্রভৃতি বাৎসরিক যজ্ঞ সেই সময়েই আরম্ভ করিতে হইবে।

বর্ষারম্ভের এই পরিবর্তন বুঝিতে হইলে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে তৎকালে সৌর বৎসর ছিল নক্ষত্র বৎসর, অয়নসংক্রান্ত বৎসর নহে। অথচ পঞ্জিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঋতুগুলির যথার্থ সময় নির্ধারণ করা। একটি স্থির নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্যের সেই নক্ষত্রে ফিরিয়া আসার কাল্পনিক সময়কে নক্ষত্র বৎসর ধরা হয় এবং সূর্যের এক বার বিষুবক্রান্তিতে অবস্থানের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় বিষুবক্রান্তিতে প্রত্যাগমনের কালকে অয়নান্ত বৎসর বলা যায়। সুতরাং তৎকালে বৎসর নাক্ষত্র বৎসর ছিল বলিয়াই প্রায়

দুই হাজার বৎসর পর পর বর্ষারম্ভের পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন হইত, ইহাতে ঋতুচক্রের সহিত বর্ষারম্ভের সামঞ্জস্য রাখা সম্ভব হইত। একটি নাক্ষত্র বৎসর ও একটি অয়নান্ত বৎসরের মধ্যে ব্যবধান প্রায় ২০ মিনিট ; সুতরাং নাক্ষত্র বৎসরকে যদি সময়ের পরিমাপক-মান ধরা যায়, তাহা হইলে প্রায় দুই হাজার বৎসরে ঋতুগুলি প্রায় এক চান্দ্র মাস পিছাইয়া যাইবে।

সুতরাং অয়নচলনের জন্য বর্ষারম্ভের বহু বার পরিবর্তন হইয়াছিল, ভারতীয় সাহিত্য ও জ্যোতিষশাস্ত্রে মধ্যবর্তী অবস্থার যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। পরিবর্তনের প্রশ্ন প্রথম উঠিল যখন দেখা গেল যে বিষুবক্রান্তি কৃত্তিকা নক্ষত্রে সরিয়া গিয়াছে এবং ঋতুগুলিও প্রায় এক মাস পিছাইয়া গিয়াছে। এই সময়ে প্রাচীন জ্যোতির্বিগণ বর্ষারম্ভ ফাল্গুনী পূর্ণিমা হইতে স্থির করিলেন এবং নক্ষত্রতালিকাও অগ্রহায়ণ হইতে না আরম্ভ করিয়া কৃত্তিকা হইতে আরম্ভ করিলেন। কোন আড়ম্বর না করিয়াই এই পরিবর্তন সাধিত হইয়া গেল, কারণ তৎকালে পঞ্জিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যজ্ঞসমূহের কাল নির্ধারণ করা এবং যখন বাস্তবিকই দেখা গেল যে দিন ও রাত্রি সমান হইলে সূর্য মার্গশীর্ষে না আসিয়া কৃত্তিকানক্ষত্রে আসিয়াছে, তখনই বর্ষারম্ভ কৃত্তিকানক্ষত্র হইতে ধরা হইল ; আর এই সময়েই পরিবর্তন প্রবর্তন করা সুবিধা-জনক বোধ হইল, যেহেতু ঋতুচক্রও তখন প্রায় এক মাস পিছাইয়া গিয়াছে। অবশ্য ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না যে এই পরিবর্তনের যথার্থ কারণ নির্ণীত হইয়াছিল কিনা, অথবা সম্যক্ অবগত হইবার চেষ্টা হইয়াছিল কিনা। ইহার পর দ্বিতীয় বার পরিবর্তন সাধিত হইল বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের সময়ে, তখন ঋতুগুলি এক পক্ষকাল সরিয়া গিয়াছে। এই সময়ে মাসের আরম্ভ পূর্ণিমায় না ধরিয়া

অমাবস্তায় ধরা হইল। মাসের আরম্ভ সম্পর্কে এই সংশোধন প্রবর্তিত হইলে ঋতুচক্র এক পক্ষকাল পিছাইয়া যাওয়ায় ধনিষ্ঠার অমাবস্তা হইতে বর্ষারম্ভ স্থির করা হইল। বেদাঙ্গজ্যোতিষ এইরূপভাবে বর্ষারম্ভ ও ঋতুচক্রের আরম্ভের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিয়া দিল। পুনরায় খ্রীষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির তৃতীয় সংশোধন প্রচলিত করিলেন এবং নক্ষত্রতালিকা অশ্বিনী হইতে আরম্ভ করা হইল। মধ্যবর্তী সময়ে পঞ্জিকা সংস্কারের আর একটি চেষ্টা হইয়াছিল, মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। দেখা গেল যে ঋতুচক্র আবার এক পক্ষ কাল পিছাইয়া গিয়াছে, তখনই এই চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু সফল হয় নাই, কারণ সাধারণ লোকে এই সংশোধন স্বীকার করে নাই। সুতরাং বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ কর্তৃক প্রবর্তিত পঞ্জিকা সংশোধনই বরাহমিহিরের সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, এবং পরে বরাহমিহির নক্ষত্রতালিকাকে অশ্বিনী নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিলে এই পরিবর্তনই সকলে গ্রহণ করিল এবং এখনও পর্যন্ত এই সংশোধিত পঞ্জিকাই চলিয়া আসিতেছে।

সম্ভবতঃ বৈদিক যুগে তিনটি ঋতুর প্রচলন ছিল, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত। শতপথ ব্রাহ্মণের এক স্থানেও তিনটি ঋতুর উল্লেখ আছে। ইহার পরে জ্যোতিষ-সংহিতার যুগে দেখা যায় যে বৃহৎসংহিতার আদিত্যাচারাধ্যায়ে শিশির অর্থাৎ শীত ঋতুকে বৎসরের প্রথম ঋতু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায় যে সে সময়ে বর্ষ মকর-সংক্রান্তিতে আরম্ভ হইত। এই পরিবর্তন বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের সময় প্রবর্তিত হইয়াছিল, এবং বর্ষারম্ভ মকরক্রান্তি হইতে ধরা হইল ; এই ব্যবস্থাই বরাহমিহিরের সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। বরাহমিহির দেখিলেন যে তৎকালে বিষুবন্ রেবতী নক্ষত্রের শেষভাগে পড়িতেছে এবং কর্কটক্রান্তি পুনর্বসু নক্ষত্রে পড়িতেছে।

সুতরাং বরাহমিহির বর্ষারম্ভের এই পরিবর্তন সাধন করিলেন এবং নক্ষত্রতালিকা অশ্বিনীনক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিলেন। তখন বিষুবন্ হইতে বৎসরের আরম্ভ হইল এবং সেই সময় হইতেই ফাল্গুন ও চৈত্র বসন্ত ঋতুর মাস বলিয়া গণ্য হইল। বরাহমিহির কর্তৃক এই সংশোধিত বর্ষারম্ভ তখন হইতে প্রচলিত হইয়াছে এবং আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের আলোচনা করা প্রয়োজন। বৎসর কখন হইতে এবং কেন 'বর্ষ' নামে অভিহিত হইল? প্রথমেই মনে হইবে যে বর্ষা ঋতুর সহিত বৎসরের নিশ্চয়ই কোন সম্বন্ধ ছিল; আর ইহাও অনুমিত হয় যে কোন-না-কোন সময়ে বর্ষা ঋতুতে বৎসরের আরম্ভ হইত এবং এই কারণেই বৎসরের 'বর্ষ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ কোন-না-কোন সময়ে দক্ষিণায়ন গতির আরম্ভের সঙ্গে বৎসরেরও আরম্ভ হইত, এইরূপ মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বেদ ও পরবর্তী ব্রাহ্মণ ও সংহিতায় কিংবা বেদাঙ্গজ্যোতিষের কোন স্থানে এই ব্যাপারের উল্লেখ নাই। অথচ কৌটিল্য তদ্‌রচিত অর্থশাস্ত্রের এক স্থানে (কালমান অধ্যায়ে) বলিতেছেন যে তাঁহার সময়ে আষাঢ়ের শেষে কর্কট-ক্রান্তিতে বৎসরের আরম্ভ হইত। তবে জৈনদিগের জ্যোতিষগ্রন্থ সূর্যপ্রজ্ঞপ্তিতে ইহার একটি বিশদ কারণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে ঋতুচক্রের আরম্ভ হয় আষাঢ় মাস হইতে। সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি ঋতুগুলির এইরূপ বর্ণনা দিয়াছে,—(১) বর্ষা, (২) শরৎ, (৩) হেমন্ত, (৪) বসন্ত ও (৫) গ্রীষ্ম। এখানে দেখা যায় যে হেমন্ত ও শিশিরকে এক ঋতু ধরিয়া ঋতুগুলির সংখ্যা পাঁচটি বলা হইয়াছে। আবার বৎসরের আরম্ভ ধরা হইয়াছে বর্ষা ঋতু হইতে।

এখন দেখা যাউক জ্যোতিষসিদ্ধান্তে ঋতুগুলির বিষয় কি বলা

হইয়াছে। পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে বরাহমিহির ফাল্গুন মাসে বিষুবন্ হইতে বর্ষারম্ভ ধরিয়াছিলেন। কিন্তু সূর্যসিদ্ধান্তে বৎসরের আরম্ভ মকরক্রান্তি হইতে ধরা হইয়াছে। সূর্যসিদ্ধান্ত বলিতেছে—মকরক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ঋতুগুলির ক্রমিক বিবরণ এই প্রকার, যথা, (১) শিশির, (২) বসন্ত, (৩) গ্রীষ্ম, (৪) বর্ষা, (৫) শরৎ ও (৬) হেমন্ত। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে সূর্যসিদ্ধান্ত বরাহমিহিরের পূর্বে যে ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছিল তাহাই গ্রহণ করিয়াছে, অর্থাৎ বেদাঙ্গজ্যোতিষ-প্রবর্তিত ব্যবস্থাই স্বীকার করিয়াছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে বর্তমান সূর্যসিদ্ধান্তের এই অংশ প্রাচীন সৌরসিদ্ধান্ত হইতে গৃহীত হইয়াছে। ভাস্কর তদ্‌রচিত সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে বসন্ত ঋতু হইতেই ঋতুচক্রের আরম্ভ করিয়া ঋতুগুলির পর-পর একটি কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা দিয়াছেন।

হিন্দুদিগের বর্ষারম্ভ ও ঋতুচক্রের একটা ক্রমিক বিবৃতি দেওয়া হইল এবং ইহাতে দেখান হইল যে বর্ষারম্ভ ও ঋতুচক্রের আরম্ভের সামঞ্জস্য করিয়া পঞ্জিকা সংস্কার করিবার জন্য হিন্দুদিগের কিরূপ প্রয়াস করিতে হইয়াছিল। এই প্রয়াসে তাঁহারা অয়নগতি প্রভৃতি জ্যোতিষের জটিল বিষয়গুলিও লক্ষ্য করিতে ভুলেন নাই এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষ বিষয়ে তাঁহাদিগের গভীর পাণ্ডিত্যের নিদর্শন দিয়া পাঠকবর্গকে মুগ্ধ করিয়াছেন।

# কাল-বিভাগের ধারা

বিজ্ঞানে ও দর্শনে কালের ধারণার প্রতিষ্ঠা হইবার বহু পূর্বে ব্যবহারিক জগতে ধর্মানুষ্ঠান ও দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য কালের পরিমাপ একান্ত প্রয়োজনীয় হইল। প্রাচীন সকল জাতির মঠ-বিহারাদি ধর্মপ্রতিষ্ঠানে পূজাপার্বণের সময় নির্ধারণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রাচীন সকল জাতির মধ্যেই এই ব্যবস্থা বর্তমান ছিল। যেহেতু অধিকাংশ ধর্মানুষ্ঠানের মূলেই ছিল সূর্যোপাসনা অথবা সূর্যের বিশেষ অবস্থানুযায়ী পূজার ব্যবস্থা, সেই কারণে সূর্যের গতি-সংক্রান্ত কালের নির্দেশবিধি হিন্দু, গ্রীক, মিসরীয়, চীন, ব্যাবিলন, হিব্রু, পারস্যদেশীয় ও প্রাচীন রোমক প্রভৃতি সকলেরই ধর্মানুষ্ঠানের একটা বিশেষ অঙ্গ হইয়াছিল। সকল জাতির মধ্যেই কালের মূলবিভাগগুলি অর্থাৎ দিন, মাস ও বৎসর একই ছিল, প্রধানতঃ পার্থক্য দাঁড়াইল কত দিনে মাস হইবে অথবা কত দিনে বৎসর হইবে এই লইয়া। আরও মতভেদ ছিল দিনের উপবিভাগ সম্বন্ধে, দিনের আরম্ভ হইবে কখন, মধ্যরাত্র, সূর্যোদয়, না মধ্যদিন (অর্থাৎ সূর্যের মাধ্যাহ্নিকে আরোহণ) হইতে, বৎসরে কয়টি মাস হইবে এবং এক মাসে কয় দিন, এই সমস্ত সম্বন্ধে। কখন বর্ষ আরম্ভ হইবে এবং মাস ও ঋতুর কিরূপ প্রাকৃতিক ব্যবস্থা হইবে এই লইয়া সকল প্রাচীন জাতিরই একটা সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল।

চন্দ্র ও সূর্যের আবর্তন স্বভাবতই কাল-পরিমাপের একটা মানদণ্ড-রূপে নির্ধারিত হইল। প্রাচীন যুগের লোকেরা চন্দ্র ও সূর্যের দৈনন্দিন আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং চন্দ্র ও সূর্যের

গতিকেই তাহারা সময়ের পরিমাপ করিবার উপযুক্ত নির্ধারক বলিয়া ধরিয়া লইল। প্রাচীন জাতিগুলির প্রাথমিক ধর্মানুষ্ঠানের পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় বিশিষ্ট কাল ও ঋতুবিভাগ সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ জ্ঞান ছিল এবং বিশেষ বিশেষ পূজা পার্বণ ঠিক ঠিক সময়ে সম্পান্ন করিবার জন্য একটা পঞ্জিকা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা প্রথম হইতেই তাহাদের মধ্যে দেখা গিয়াছিল। অবশ্য, প্রাচীন যুগে এইরূপ পঞ্জিকা প্রথমে অসম্পূর্ণ ধরনের হইবারই কথা, কিন্তু পরে ইহার নানাবিধ সংস্কার ও সংশোধন হইয়াছিল। সকল সময়েই ধর্মানুষ্ঠানের পক্ষে উহার উপযোগিতার দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইতেছিল।

প্রাচীন হিন্দুরা প্রধানতঃ যাগযজ্ঞ সম্পাদনের জন্যই পঞ্জিকা প্রস্তুত করিতেন, এবং বিভিন্ন যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানের উপরই এই পঞ্জিকার প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিত। যখন এই যজ্ঞগুলি ধারাবাহিকভাবে শেষ হইত, তখনই দেখা যাইত বৎসরও শেষ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং বৈদিক যুগে বৎসর ও যজ্ঞ একার্থবোধক শব্দে পরিণত হইয়াছিল। প্রায় ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বে রচিত ঋগ্‌বেদের যজ্ঞ সম্বন্ধীয় ঋক্ হইতে অনুমান করা যায় যে যজ্ঞানুষ্ঠানের একটা ক্রমবিকাশ হইয়াছিল। কোনও যজ্ঞানুষ্ঠানের পদ্ধতি নির্ভুলভাবে বিধিবদ্ধ হইতেই পারে না, যদি মাস, ঋতু ও বৎসরের সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকে, সুতরাং ইহা বলা অন্যায় হইবে না যে, বৈদিক যুগে যজ্ঞানুষ্ঠানকে নিয়মিত করিবার জন্য কোনও একপ্রকার পঞ্জিকা প্রচলিত ছিল। এই পঞ্জিকা কি প্রকারের ছিল বা কতটা উন্নত ছিল, তাহা নির্ধারণ করা কঠিন, তবে বৈদিক যজ্ঞ-সাহিত্যের আলোচনায় ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে সেই প্রাচীন কালে চন্দ্রের বিভিন্ন কলা, ঋতুর পরিবর্তন ও সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন সময়ের পরিমাপ করিবার প্রধান উপায় বলিয়া গণ্য হইত। হিন্দুদিগের

পঞ্জিকা নিয়মিত করিতে মাঝে মাঝে যে বাধা উপস্থিত হইত, তাহাতেই উহার গণনা-পদ্ধতির পরিবর্তন হইত। কোন এক সময়ে চন্দ্রের গতিকে ভিত্তি করিয়া গণনার কার্য চলিত এবং চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া চান্দ্রমাস গঠিত হইত। প্রাচীন হিন্দুরা দেখিলেন যে এক রাত্রিতে চন্দ্র একেবারে অদৃশ্য হয় এবং আর এক রাত্রিতে সম্পূর্ণ ও গোলাকার হইয়া থাকে; তাঁহারা চন্দ্রের এই দুই অবস্থাকে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা আখ্যা দিলেন। তাঁহারা আরও দেখিলেন যে এক অমাবস্যা হইতে আর এক অমাবস্যা পর্যন্ত অথবা এক পূর্ণিমা হইতে আর এক পূর্ণিমা পর্যন্ত ত্রিশ বার সূর্যোদয় হইয়া থাকে। ইহার পরে কালক্রমে মাস-গণনার পরিবর্তন হইল; সূর্যের গতিকে ভিত্তি করিয়া সৌরমাস গঠিত হইল। রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশির এক রাশিতে অবস্থান করিতে সূর্যের যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহাকে এক সৌরমাস বলা হইল। তারপর আবার কতকটা পরিবর্তন ঘটিল, চন্দ্রের গতির ভিত্তিতে ও সূর্যের গতির ভিত্তিতে গণনায় দুই ভিন্ন পদ্ধতিকে সামঞ্জস্যে আনিবার চেষ্টা হইল, ইহাতে দুই প্রকার মাসের অর্থাৎ চান্দ্রমাস ও সৌরমাসের মূল প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রহিল। সৌরমাস সৌর দিনে এবং চান্দ্রমাস তিথি বা চান্দ্রদিনে গণ্য হইল। এই চান্দ্র দিন সূর্য ও চন্দ্রের দুইটি যুতির (conjunction) মধ্যকালীন সময়ের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ বলিয়া ধরা হইল। ইহার ফলে চান্দ্র-সৌর ( luni-solar ) বৎসরের গঠন হইল; দিন হয় সৌর, না হয় চান্দ্র, দুই প্রকারই রহিল। হিন্দুরা পর্যবেক্ষণের দ্বারা আরও লক্ষ্য করিলেন যে কোন এক দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে নক্ষত্র উদিত বা অস্তমিত দেখা যায়, কিছু দিন পরে তাহার পরিবর্তন হয়। ইহাতে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে সূর্যের ও চন্দ্রের ন্যায় ব্যোমপথে নক্ষত্রদিগের মধ্যে একটা গতি

আছে এবং গতিপথে একবার পরিক্রমণ করিতে বারো মাস অতিবাহিত হয় অর্থাৎ যে নক্ষত্র এক দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে উঠিতে দেখা যায়, তাহাকে আবার সূর্যোদয়ের সঙ্গে উঠিতে বারো মাস পরে দেখা যাইবে। এই গণনানুসারে এক বৎসর অর্থাৎ সূর্যের এক বার পরিক্রমণের সময় তাঁহারা বারো মাস ধরিলেন। দিনের আরম্ভ লইয়া হিন্দুরা বহু পরিবর্তন করিয়াছিলেন। বেদ ও পুরাণের সময়ে তাঁহারা সূর্যোদয় হইতেই দিনের আরম্ভ ধরিতেন, কিন্তু পরবর্তীকালে এ সম্বন্ধে নানা মতের আবির্ভাব হইয়াছিল। আর্যভট দিনের আরম্ভ ধরিয়াছিলেন লঙ্কায় সূর্যোদয় হইতে, বরাহমিহির ধরিয়াছিলেন মধ্যরাত্র হইতে। এই রকমে চার প্রকারের দিনের আরম্ভের উল্লেখ পাওয়া যায়, সূর্যোদয়, মধ্যরাত্র, মধ্যদিন বা সূর্যাস্ত হইতে, কিন্তু সূর্যোদয় হইতে দিনের আরম্ভই হিন্দুদিগের মধ্যে অধিক প্রচলিত। সময়ের পরিমাপ করিবার জন্য অতি প্রাচীনকালে সূর্যঘড়ির আবিষ্কার হইয়াছিল, ইহাতে বারোটি অঙ্গুলি নির্দেশিত ছিল, উহাতে সূর্যের ছায়া মাপিয়া সময়ের নির্ধারণ হইত। সম্ভবতঃ সূর্যের গতির সঙ্গে সঙ্গে একটা বৃক্ষের ছায়ার হ্রাসবৃদ্ধি হইতে সূর্যঘড়ির কল্পনা জাগিয়া থাকিবে। কিন্তু সূর্যঘড়ি দিনের বেলায় বা সূর্য দেখা গেলে সময়ের পরিমাপ করিতে সমর্থ হইলেও সূর্যাস্তের পরে বা সূর্য না দেখা গেলে সূর্যঘড়ির উপযোগিতা ছিল না। এই জন্যই সময়ের পরিমাপ করিতে জলঘড়ির আবিষ্কার হইল; একটি জলপাত্রে একটি ধাতুনির্মিত বাটি ভাসাইয়া দেওয়া হইত এবং উহাতে যে জল রাখা হইত তাহা তলার একটি ফুটা দিয়া এক নাড়িকা বা ২৪ মিনিটে বাহির হইয়া যাইত। ইহার ব্যবহারে হিন্দুরা এমনই পারদর্শী হইয়াছিলেন যে এই জলঘড়ি দেখিয়াই তাঁহারা বলিতে পারিতেন সূর্যোদয় হইতে কত সময় অতিবাহিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন আর একটি যন্ত্র তাঁহারা বাহির করিয়াছিলেন,

উহাকে যষ্টি আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল, উহাতে সূর্যের মাধ্যাহ্নিকে অবস্থান অর্থাৎ মধ্যদিন হইতে সময়ের পরিমাণ পাওয়া যাইত।

কেলডীয়ানরা বৎসরের পরিমাপ খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ১১ মিনিটে এক সৌর বর্ষ, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে তাঁহারা চান্দ্রমাস ও সৌরবৎসর দুইই ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা দিন ও রাত্রি উভয়কেই বারো ভাগে ভাগ করিলেন এবং সূর্যঘড়ি ও জলঘড়ির সাহায্যে সময়ের পরিমাপ করিতেন। তাঁহারা দিনের বেলায় সূর্যঘড়ি এবং রাত্রিকালে জলঘড়ি ব্যবহার করিতেন। জ্যোতিষিক গণনার প্রয়োজনে তাঁহারা এক দিনকে বারো সমান ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগকে এক ঘণ্টা ধরিলেন। তাঁহারাই বোধ হয় সর্বপ্রথমে এক মাসকে চারি ভাগে ভাগ করিয়া সময়ের বিভাগের আর এক পর্যায়ে নামিলেন। প্রাচীন যুগে চান্দ্রমাস ব্যবহারের সময়ে অর্ধ মাস নিশ্চয়ই জানা ছিল, কারণ এক অমাবস্যা হইতে পরবর্তী পূর্ণিমার ব্যবধান ছিল অর্ধ মাস, এবং উহারই অর্ধেক লইয়া সপ্তাহের বিভাগের সূচনা হইয়াছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ বৎসরের আগেও চীনদেশীয়েরা পঞ্জিকা গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহাদের পদ্ধতি প্রত্যেক সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইত। সম্রাট্ য়্যান (Yan, c. 2357 B. C.—2258 B. C.)-এর সময়ে সমস্ত দেশে একই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পঞ্জিকা প্রচলনের চেষ্টা হইয়াছিল, সম্ভবতঃ ইহারও পূর্বে সম্রাট্ হুয়াঙগটির (Hung-ti, c. 2700 B. C.) সময় হইতেই আরম্ভ হইয়া থাকিবে। প্রমাণ আছে যে সম্রাট্ ওয়াং ওয়াংগ (Wan Wang, 1122 B. C.)-এর এক নির্দেশে দিনের আরম্ভ মধ্যরাত্র হইতে ধরা হইল, অথচ ইহার পূর্বে সাংগ-বংশের (১৭৬৬-১১২২ খ্রীঃ পূঃ) সময়ে মধ্যদিন হইতে দিনের আরম্ভ

ধরা হইত। বর্তমান চীনা-পঞ্জিকায় এক সৌর দিনকে বারো ঘণ্টায় ভাগ করা হইয়াছে এবং প্রথম ঘণ্টার অর্ধ ভাগ হইতে মধ্যরাত্রির আরম্ভ ধরা হয়। চীনা ভাষায় চীনা ঘণ্টাকে শি ( Shi ) বলা হইয়া থাকে, এক শি ইংরেজী ১২০ মিনিটের সমান। এক শি আট ভাগে বিভক্ত, উহাকে খে (khe) বলা হয়, এক খে ইংরেজী এক ঘণ্টার এক-চতুর্থ অংশ অর্থাৎ ১৫ মিনিটের সমান। এক খে আবার ১৫ ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগকে বলা হয় ফেন্ (fen), তাহা হইলে এক ফেন্ ইংরেজী এক মিনিটের সমান; এক ফেন্‌কে আবার ৬০ ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক ভাগকে বলা হয় মিয়াও ( Miao ), এক মিয়াও এক সেকেণ্ডের সমান। বর্তমান সময়ে চীন দেশে আমেরিকার ঘটিকাযন্ত্রের বহুল পরিমাণে ব্যবহার হইতেছে। চীনদেশেও সাত দিনের একটা কালবিভাগ ধরা হইয়াছিল এবং মাস চান্দ্র তিথিতে বিভক্ত হইয়া অমাবস্যা হইতে পরিগণিত হইত।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে মিসরবাসীরা একটা স্থির বর্ষের উপযোগিতা বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু দেশের জনসাধারণের ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে একটা পরিবর্তনশীল বৎসর এমন ভাবে জড়িত ছিল, যে, তাঁহারা ইহাও একেবারে ছাড়িয়া দিতে পারেন নাই। ঋতু বিভাগের সময়ে স্থির বর্ষই ধরা হইত এবং নদীর অবস্থানুসারে এক বর্ষে তিনটি ঋতু ধরা হইত; যেমন বারি ঋতু, উদ্যান ঋতু ও ফল ঋতু; প্রথমটি ২১ জুন হইতে ২০ অক্টোবর, দ্বিতীয়টি ২১ অক্টোবর হইতে ২০ ফেব্রুআরি এবং তৃতীয়টি ২১ ফেব্রুআরি হইতে ২০শে জুন পর্যন্ত। এইগুলি মন্দিরের যাজকসম্প্রদায় কর্তৃক নির্ধারিত হইত। তাঁহারা অভ্যাসের দ্বারা সহজেই ইহার নির্ধারণ করিতে পারিতেন এবং তাঁহারাই দেশের প্রধান পঞ্জিকাকার ছিলেন। মন্দির হইতে নীল নদের জলের বৃদ্ধি

ও হ্রাসের ঘোষণা হইত, মন্দিরে যাজকসম্প্রদায়ের পর্যবেক্ষণে জলের বৃদ্ধি ও হ্রাস মাপিবার যন্ত্র থাকিত। প্রাচীন মিসর দেশে ব্যবহারিক প্রয়োজনে রাত্রি দিনের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং পৃথক্ দিন ও রাত্রি প্রত্যেকটি বারো ঘণ্টায় বিভক্ত হইত; কিন্তু এই ঘণ্টার মাপ ঋতুর তারতম্যের সহিত পরিবর্তিত হইত। প্রাচীন মিসরে দিবসের আরম্ভ হইত সূর্যাস্ত হইতে। কিন্তু ঐতিহাসিক প্লিনি ( Pliny ) বলেন যাজক-সম্প্রদায় মধ্যরাত্র হইতে দিবসের আরম্ভ ধরিতেন। পরবর্তী কালে দিনের আরম্ভ হইত মধ্যদিন হইতে এবং দিনকে চব্বিশ সমান ঘণ্টায় ভাগ করা হইত। প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী টলেমিও ( Ptolemy ) ইহাই করিয়াছিলেন। মিসর দেশের জাতীয় পঞ্জিকায় শেষের মাস ছাড়া প্রত্যেক মাসে ত্রিশ দিন, শেষের মাসে ( Mesori ) পাঁচ দিন বেশি ধরা হইত এবং ইহাতে এক বৎসরে সর্বসমেত ৩৬৫ দিন হইত। এই গণনায় এক-চতুর্থ দিবসের ভুল থাকিয়া যাইত। সুতরাং বর্ষ স্থির না হইয়া পরিবর্তনশীল হইত এবং জ্যোতিষ্কদিগের অবস্থানের তুলনায় বর্ষারম্ভ প্রথম অবস্থায় আসিতে ৪ × ৩৬৫ বা ১৪৬০ ( ১৪৬১ মিসর দেশীয় ) বৎসর লইত। মিসরে বর্ষারম্ভ হইত থথ্ ( Thoth ) মাসের প্রথম দিন হইতে, এই থথ্ ছিলেন মিসরের এক প্রসিদ্ধ দেবতা। তিনিই পঞ্জিকা ও সংখ্যা মিসরে আনিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাত। ইহার পরে মিসর যখন রোম সাম্রাজ্যের অধীন হইল খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম অর্ধশতাব্দীতে, তখন আলেকজান্দ্রিয়ার পঞ্জিকার সহিত উহার স্থির বর্ষও মিসরে আসিল, কিন্তু জনসাধারণ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত তাহাদের পরিবর্তনশীল বর্ষই ব্যবহার করিত। আলেকজান্দ্রিয়ার পঞ্জিকা মিসরে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত চলিয়াছিল। এই সময়ে মিসর আলেকজান্দ্রিয়ার সহিত মুসলমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। সুতরাং

পঞ্জিকারও পরিবর্তন দেখা দিল, কেবল উত্তর-মিসরে প্রাচীন পঞ্জিকা চলিতে লাগিল। পরে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন ফরাসীরা অল্প সময়ের জন্য মিসর জয় করিয়াছিল, তখন মিসরে ইওরোপীয় পঞ্জিকা মুসলমান পঞ্জিকার সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত হইল।

প্রাচীন এথেন্সবাসীরা মিসরীয়দিগের অনুসরণে সূর্যাস্ত হইতে নূতন দিনের আরম্ভ ধরিতেন এবং দিন ও রাত্রি উভয়কেই বারো ঘণ্টায় বিভক্ত করিলেন। তখনও তাঁহারা সাত দিনে সপ্তাহ ব্যবহার করেন নাই। তাঁহারা চান্দ্রমাসকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন, প্রথম ভাগ দশ দিনে বিভক্ত হইল এবং এই দিনগুলিকে তাঁহারা ক্রমিক সংখ্যা দিলেন, যেমন প্রথম ভাগের পঞ্চম দিনকে তাঁহারা পঞ্চমী আখ্যা দিলেন। তাঁহারা দ্বিতীয় ভাগকেও দশ দিনে বিভক্ত করিলেন এবং পূর্বের মতই ক্রমিক সংখ্যা দিলেন, পার্থক্যের মধ্যে তাঁহারা এই দিনগুলিকে একোত্তর দশ বা একাদশ, দ্বাদশ প্রভৃতি বিংশতি পর্যন্ত নাম দিলেন। মাসের শেষের ভাগও দশ দিনে বিভক্ত হইল এবং উহাদের নাম হইল একবিংশতি, দ্বাবিংশতি হইতে ত্রিংশৎ পর্যন্ত। কখনও কখনও এই গণনা প্রথম হইতে না হইয়া মাসের শেষ হইতে ধরা হইত। এক অমাবস্যা হইতে পরের অমাবস্যা পর্যন্ত এক চান্দ্রমাস ধরা হইত, এবং এইরূপ বার মাসে এক বৎসর। সুতরাং এক বৎসরে হইল ৩৫৪ সৌর দিন। ইহাতে সৌর বর্ষের হিসাবে প্রায় ১১ দিন কম পড়িল এবং তিন বৎসর অন্তর এক মাস বেশি করিয়া এক বৎসরে ধরিতে হইত। ইহাকে এথেন্সবাসীরা বলিতেন পসিডনের দ্বিতীয় মাস (second month of Poseidon)। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৩২ সালে মেটন (Meton) ঊনবিংশতি বৎসরের একটা কালচক্র স্থির করিলেন এবং ইহাতে তৃতীয়, পঞ্চম, অষ্টম, একাদশ, ত্রয়োদশ, ষোড়শ ও ঊনবিংশতি বৎসরে একটি অধিক

মাস যোগ করিয়া দিলেন। তাহা হইলে ১৯ বৎসরে হইল (১৯×১২+৭) ২৩৫ মাস এবং ৬৯৩৯৪/৫ দিন। কিন্তু সাধারণ ব্যবহারে এমন ভাবে দিনের সংখ্যা লওয়া হইত যাহাতে ১৯ বৎসরে ৬৯৪০১/৩ দিন পাওয়া যাইত। খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫ সালে ক্যালিপাস ( Callipus ) চার গুণ উনিশ লইয়া ৭৬ বৎসর বা ৯৪০ মাস লইয়া একটা কালচক্র স্থির করিলেন; তিনি ২৯ ও ৩০ দিনে মাস ধরিয়া ৯৪০ মাসে ২৭৭৫৯ দিন নির্ধারিত করিলেন। ইহার পরে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০ সালে হিপার্কস ( Hipparchus ) ১৬ গুণ উনিশ ৩০৪ বৎসর লইয়া একটা কালচক্র স্থির করেন। কিন্তু শেষোক্ত দুইটি কালবিভাগ কখনও জনসাধারণের ব্যবহারে আসে নাই।

রোমবাসীরা সাত দিনে এক সপ্তাহ ধরিলেন এবং গ্রহগুলিকে নিম্ন পর্যায়ক্রমে প্রতি দিনের এক একটি ঘণ্টার অধিপতি স্থির করিলেন— শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, রবি, শুক্র, বুধ ও সোম। তখন রবি ও সোম গ্রহ বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই পর্যায় তাঁহারা আরম্ভ করিলেন শনিবারের প্রথম ঘণ্টা হইতে, তাহা হইলে শনিবারের দ্বিতীয় ঘণ্টার অধিপতি বৃহস্পতি, তৃতীয় ঘণ্টার অধিপতি মঙ্গল, চতুর্থ ঘণ্টার অধিপতি রবি; এইরূপে চতুর্বিংশতিতম ঘণ্টার অধিপতি মঙ্গল। দ্বিতীয় দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি হইবে রবি, তৃতীয় দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি হইবে সোম, চতুর্থ দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি হইবে মঙ্গল, পঞ্চম দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি হইবে বুধ, ষষ্ঠ দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি হইবে বৃহস্পতি এবং সপ্তম দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি হইবে শুক্র। এই প্রকারে রোমবাসীদের সপ্তাহের সাত দিনের নাম, সাত দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি গ্রহের নাম হইতে উৎপন্ন হইল। তাহা হইলে প্রথম দিন হইল শনিবার

( Saturn's Day ),দ্বিতীয় দিন রবিবার ( Sun's Day ), তৃতীয় দিন সোমবার (Moon's Day), চতুর্থ দিন মঙ্গলবার (Mar's Day, ফরাসী Merdi—মার্ডি), পঞ্চম দিন বুধবার (Mercury's Day, ফরাসী Mercredi—মারক্রেডি), ষষ্ঠ দিন বৃহস্পতিবার (Jupiter's Day, উত্তর ভূভাগে Thor's Day ), এবং সপ্তম দিন শুক্রবার ( Venus' Day, Frigg's Day, Frigg বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী )। কথিত আছে যে রোমের প্রতিষ্ঠাতা রোমুলাস ( Romulus ) রোমের প্রাচীনতম পঞ্জিকার ব্যবস্থাপক। ইহাতে এক বৎসরে দশ মাস ধরা হইত। প্রত্যেক মাসের দিনের সংখ্যা সমান ছিল না, এবং এক বৎসরে দিনের সংখ্যা ছিল ৩০৪। তখন মার্চ মাস হইতে বৎসরের আরম্ভ ধরা হইত। পরে নুমা পম্পিলিয়াস (Numa Pompilius, ৭১৫—৬৭২ খ্রীষ্টপূর্ব ) আরও দুই মাস যোগ করিয়া দিলেন, উহাদের নাম দিলেন জানুআরি ও ফেব্রুআরি এবং বৎসরকে চান্দ্র বৎসর ধরিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ডিসেমভিরের ( Decemvirs ) নির্দেশক্রমে সৌর বৎসর স্থির হইল, অবশ্য ইহার ব্যবস্থার ভার পড়িল যাজক-সম্প্রদায়ের উপর। কিন্তু এই পঞ্জিকার ব্যবস্থায় এমন বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িল যে জুলিয়াস সিজারের ( Julius Caesar ) সময়ে বৎসরের প্রত্যেক দিন জ্যোতিষিক অবস্থানের তুলনায় আশী দিন পিছাইয়া পড়িল। সুতরাং পঞ্জিকা-সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিল। তখন জুলিয়াস সিজার নির্দেশ দিলেন যে খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬ সালে এক বৎসরে ৪৪৫ দিন ধরিতে হইবে এবং পরে প্রত্যেক বৎসরে ৩৬৫ দিন, আর প্রত্যেক চতুর্থ বৎসরে ৩৬৬ দিন। পূর্বে বলা হইয়াছে, সৌর বৎসর অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্তে সূর্যের এক বার পরিক্রমণের সময় প্রায় ৩৬৫$\frac{1}{4}$ দিন, অর্থাৎ বিষুববিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া আবার সেই বিষুববিন্দুতে আসিতে

সূর্যের ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৫·৫ সেকেণ্ড লাগে। ইহাই হইল আসল সৌর বৎসর। সুতরাং ব্যবহারিক জীবনে বৎসরকে ৩৬৫ দিনের ধরিলে জ্যোতিষিক সৌর বৎসর হইতে ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৫·৫ সেকেণ্ড কম ধরা হইল, এই ভুল চারি বৎসরে ২৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ২ সেকেণ্ড বা প্রায় এক দিনে পরিণত হইবে। এই ভুলের সংশোধন না হইলে প্রত্যেক চারি বৎসরে ক্রান্তিপাতের সময় এক দিন পিছাইয়া যাইবে। এই সংশোধন করিবার চেষ্টা জুলিয়াস সিজারই প্রথম করিলেন এবং তাঁহার নির্দেশে প্রত্যেক চতুর্থ বৎসরে এক দিন বেশী অর্থাৎ ৩৬৬ দিন ধরা হইল। সিজার নিম্নলিখিত প্রণালীতে বৎসরে মাসের ক্রম ও দিনের সংখ্যা নির্ধারিত করিলেন :

| | মাসের নাম | দিনের সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১। | মার্সিয়াস ( Martius ) | ৩১ |
| ২। | এপ্রিলিস ( Aprilis ) | ৩০ |
| ৩। | মেয়াস্ ( Maius ) | ৩১ |
| ৪। | জুনিয়াস্ ( Junius ) | ৩০ |
| ৫। | কুইন্‌টিলিস ( Quintilis ) | ৩১ |
| ৬। | সেক্সটিলিস্ ( Sextilis ) | ৩১ |
| ৭। | সেপ্টেম্ব্রিস ( Septembris ) | ৩০ |
| ৮। | অক্টোব্রিস্ ( Octobris ) | ৩১ |
| ৯। | নভেম্ব্রিস্ ( Novembris ) | ৩০ |
| ১০। | ডিসেম্ব্রিস্ ( Decembris ) | ৩১ |
| ১১। | জানুআরিয়াস্ ( Januarius ) | ৩১ |
| [illegible] | [illegible] | ২৮ |

ইহাতেই দেখা যায় যে পঞ্জিকার প্রথম বিধানে মার্চ মাস হইতে

বৎসর আরম্ভ হইত। কারণ, মূল শব্দ হইতেও দেখা যায় যে, কুইন্‌টিলিস্‌ অর্থে পঞ্চম মাস, সেক্সটিলিস অর্থে ষষ্ঠ মাস, সেপ্টেম্বার অর্থে সপ্তম মাস, অক্টোবর অষ্টম মাস, নভেম্বর নবম মাস এবং ডিসেম্বর দশম মাস। জুলিয়াস সিজার তাঁহার প্রথম নির্দেশে স্থির করিয়াছিলেন যে মার্চ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া মাসগুলির দিনসংখ্যা পর্যায়ক্রমে ৩১ ও ৩০ হইবে, কেবল ফেব্রুআরি মাসে ২৯ দিন থাকিবে এবং প্রতি চতুর্থ বৎসরে ফেব্রুআরি মাস ৩০ দিনের হইবে। পরে আবার নির্দেশ দিলেন যে, বৎসর জানুআরি মাস হইতে আরম্ভ হইবে। পরিশেষে তাঁহারই জীবদ্দশায় তিনি পঞ্চম মাস কুইনটিলিস্‌কে নিজের জুলিয়াস নামে পরিবর্তিত করিলেন, তিনি নিজে ঐ মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আরও কয়েকটি মাসের দিনসংখ্যার পরিবর্তন করিয়াছিলেন, ইহারই ফলে বর্তমান জুলিয়ান পঞ্জিকা। জুলিয়াস সিজারের মৃত্যুর পর তাঁহার নির্দিষ্ট পঞ্জিকার দ্বিতীয় বর্ষেই পুরোহিত সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত বিধানে চতুর্থ বর্ষের অর্থাৎ যে বৎসরে ফেব্রুআরি মাসে এক দিন যোগ করিতে হইবে তাহার নির্ধারণে গোল বাধিল। অগাষ্টাস সিজার তখন সম্রাট্, তিনি ইহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহারই সম্মান প্রদর্শনার্থে সেক্সটিলিস (ষষ্ঠ মাস) অগাষ্টান নামে পরিবর্তিত হইল। সেই হইতে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অগাষ্টাস সিজার সংশোধিত জুলিয়ান পঞ্জিকাই ইওরোপে চলিয়া আসিতেছিল। এই সময়ে পোপ ত্রয়োদশ গ্রীগরী পঞ্জিকার আর একটু সংস্কার করিলেন। জুলিয়াস সিজারের বিধানানুসারে প্রতি চতুর্থ বৎসরে এক দিন বেশী ধরা হইত। কিন্তু ব্যবহারিক এক দিন ২৪ ঘণ্টা আর সৌর দিন ২৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ২ সেকেণ্ড, অর্থাৎ ব্যবহারিক দিন সৌর এক দিন হইতে প্রায় ৪৫ মিনিট বেশী।

সুতরাং চতুর্থ বর্ষে ব্যবহারিক এক দিন যোগ করায় চার বৎসরে প্রায় ৪৫ মিনিটের ভুল হইল অর্থাৎ বৎসরে প্রায় ১১ মিনিট বেশি হইল। ইহাতে চার শত বৎসরে ভুল প্রায় তিন দিনে দাঁড়াইবে। এই জন্যই পোপ গ্রীগরী নির্দেশ দিলেন যে, প্রতি চার শত বৎসরে তিনটি কম লীপ্ ইয়ার ( Leap year ) ধরিতে হইবে, অর্থাৎ ১০০, ২০০, ৩০০ বৎসরে এক দিন করিয়া যোগ দিতে হইবে না ; জুলিয়ান পঞ্জিকায় পোপ গ্রীগরীর সংশোধনানুসারে এক শতের দুই গুণ, তিন গুণ, পাঁচ গুণ, সাত গুণ প্রভৃতি বৎসর যাহা জুলিয়ান পঞ্জিকানুযায়ী লীপ ইয়ার হইত, সাধারণ বৎসর বলিয়াই পরিগণিত হইবে,কেবল যে সকল শতক চার দিয়া ভাগ দিলে ভাগশেষ থাকিবে না অর্থাৎ ১৬০০, ২০০০, ২৪০০ ইত্যাদি, তাহারা লীপ ইয়ার হইবে। এই সংশোধনে চারি শত বৎসরে তিন দিন বাদ দেওয়া হইল। পোপ গ্রীগরীর সংশোধন সত্ত্বেও খুব সামান্য একটু ভুল রহিয়া গিয়াছে, ইহা এত সামান্য যে ৩২০০ বৎসরে প্রায় এক দিন হইবে। ইংলণ্ডে ১৭৫২ সাল পর্যন্ত গ্রীগরীর সংশোধন গ্রহণ করা হয় নাই, ফলে সংশোধিত পঞ্জিকানুসারে ইংলণ্ডের পঞ্জিকায় মোট ১১ দিনের ভুল জমা হইয়া ছিল। সুতরাং ১৭৫২ সালে ১১ দিন ছাড়িয়া দেওয়া হইল এবং ২রা সেপ্টেম্বরকে ১৩ সেপ্টেম্বর ধরা হইল। ইওরোপের সর্বত্র এই সংশোধিত পঞ্জিকা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কেবল গ্রীস দেশে ক্যাথলিক সম্প্রদায় এবং রাশিয়ার পুরোহিত সম্প্রদায় ১৯১৪-১৮ সাল পর্যন্ত জুলিয়ান পঞ্জিকা ব্যবহার করিতেছিল। তখন পশ্চিম ইওরোপের সর্বত্র সংশোধিত পঞ্জিকা ব্যবহৃত হইতেছিল এবং উহার তুলনায় রাশিয়ার পঞ্জিকায় তের দিনের পার্থক্য দেখা দিয়াছিল। এখন সর্বত্র এই গ্রীগরী-সংশোধিত পঞ্জিকার প্রচলন হইয়াছে।

প্রাচীন পারসিকেরা সর্বপ্রথমে সৌর বৎসর ব্যবহার করিতেন, কিন্তু

পরে চান্দ্র বৎসর ও হিজিরা পঞ্জিকা ( Hejira ) গ্রহণ করিলেন। শীঘ্রই মুসলমান সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল ঋতুকালীন ভূমি-রাজস্ব আদায়ের জন্য সৌর বৎসরের হিসাব রাখা একান্ত প্রয়োজন। অথচ মুসলমান সম্রাটেরা চান্দ্র বৎসর ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না, যেহেতু মোহম্মদ ইহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশেষে একটা সামঞ্জস্য বিহিত হইল, ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের জন্য প্রাচীন পারসিকদিগের সৌর বৎসর স্বীকৃত হইল এবং রাজ্যের অন্য সমস্ত কার্যের জন্য চান্দ্র বৎসরই প্রচলিত রহিল। প্রাচীন পারসিক পঞ্জিকাতেও ঋতুগুলি আর নির্ভুল ভাবে সূচিত হইতেছিল না; কারণ প্রতি চতুর্থ বর্ষে ( Leap year ) পারসিক বৎসরে যে এক দিন যোগ করা হইত তাহা প্রাচীন পারসিকেরা ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ বলিয়া ধরিয়াছিলেন, এখন মুসলমান সম্রাটেরা মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত পারসিকদিগকে তাহাদের পুরাতন ধর্ম ভুলাইবার জন্য সেই বেশি দিন যোগ করা আইনের নির্দেশে বন্ধ করিয়া দিলেন। ফলে ঋতু নির্ণয়ে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। পারস্য দেশের বিখ্যাত সম্রাট্ মালিক শাহ একাদশ খ্রীষ্টাব্দে এই বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করিয়া তৎকালীন শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষিক ওমর খৈয়ামের (শ্রেষ্ঠ কবিও) উপর ইহার সামঞ্জস্য বিধানের ভার দিলেন। ইস্পাহান মানমন্দিরে পর্যবেক্ষণ ও গণনা করিয়া ওমর তাঁহার সৌর বৎসর সংযুক্ত পঞ্জিকা লিপিবদ্ধ করিলেন। ওমরের গণনায় যে সৌর বৎসর হইল উহাতে তিনি ৩৬৫ দিন ১৫ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট ধরিলেন, ইহা বর্তমান সময়ে স্বীকৃত সৌর বৎসর হইতে মাত্র ১১ সেকেণ্ড অধিক। ওমরের পূর্বে বৎসরের আরম্ভ ধরা হইত সেই দিন হইতে, যে দিন সূর্য মীন রাশিতে প্রবেশ করিত, ওমর পূর্বের ভুল গণনা সংশোধন করিয়া যেদিন সূর্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করে সেই দিনের মধ্যাহ্ন হইতে বৎসরের আরম্ভ ধরিলেন। সেদিন বিষুব সংক্রান্তি, শুক্রবার ১৫ই

মার্চ ১০৭৯ খ্রীষ্টাব্দ; ইহাই হইল ওমরের পঞ্জিকার প্রথম দিন। বৎসরকে তিনি বার মাসে বিভক্ত করিয়া প্রথম এগারো মাসে ৩০ দিন আর দ্বাদশ মাসে ৩৫ দিন ধরিলেন, ইহাতে সাধারণ বৎসরে দিনের সংখ্যা হইল ৩৬৫; এবং প্রতি চতুর্থ বৎসরে তিনি দ্বাদশ মাসে ৩৬ দিন ধরিয়া সেই বৎসরে দিনের সংখ্যা ৩৬৬ পাইলেন। কিন্তু তাঁহার পঞ্জিকায় বত্রিশ সংখ্যক বৎসর সাধারণ নিয়মে ৩৬৬ দিনের হইলেও উহাকে ৩৬৫ দিনেরই ধরা হইল এবং তেত্রিশ সংখ্যক বৎসরকে ৩৬৬ দিনেই গণ্য করা হইল। এইরূপে ওমর তেত্রিশ বৎসরের একটা কালচক্র ধরিলেন, উহাতে ২৫টি সাধারণ বৎসর ও ৮টি ৩৬৬ দিনের বৎসর। পারস্ত জাতির পঞ্জিকা-গুলির মধ্যে ওমরের সংশোধিত পঞ্জিকা সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ; ইহাতে ১০,০০০ বৎসরে ৩৬৫২৪২৪ সৌর দিন, অথচ বর্তমান সময়ে প্রচলিত গ্রীগরীর পঞ্জিকায় ১০, ০০০ বৎসরে ৩৬৫২৪২৫ সৌর দিবস, জ্যোতিষিক গণনায় ১০,০০০ সৌর বৎসরে বাস্তবিক হওয়া উচিত ৩৬৫'২৪২২× ১০,০০০ অর্থাৎ ৩৬৫২৪২২ সৌর দিবস। সুতরাং বৈজ্ঞানিক হিসাবে বর্তমান সময়ে ইওরোপে প্রচলিত পঞ্জিকা হইতে ওমরের পঞ্জিকা বিশুদ্ধ-তর, ইহাতে ১০,০০০ বৎসরে মাত্র দুই দিনের ভুল আর ইওরোপীয় পঞ্জিকায় তিন দিনের ভুল। এই পঞ্জিকা সেলজুক ও খোয়ারিজ্‌মি ( Seljuks and Khowarizmis ) সম্রাট্‌গণের সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। পরে তাতার সম্রাটেরা ইহা বন্ধ করিয়া দিয়া হিজিরা পঞ্জিকারই পুনঃপ্রচলন করিলেন। ওমরের পঞ্জিকা এখনও কিছু পরিবর্তিত হইয়া ভারতবর্ষে পারসিকদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে।

প্রাচীন শতাব্দীতে খ্রীষ্টীয় পঞ্জিকায় সাধারণতঃ পূর্ব ইওরোপে এপ্রিল মাস হইতে এবং পশ্চিম ইওরোপে মার্চ মাস হইতে বর্ষারম্ভ ধরা হইত। কখনও কখনও পোপদিগের খেয়াল অনুসারে খ্রীষ্টমাস

দিবস বা ইষ্টার দিবস অথবা অন্য কোন পার্বণের দিন হইতে বৎসরের আরম্ভ প্রচলিত হইত। স্পেনদেশে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ১লা মার্চ হইতে এবং জার্মাণ দেশে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ২৫শে মার্চ হইতে বর্ষারম্ভের প্রথা ছিল, কিন্তু ধর্মানুষ্ঠানের জন্য খ্রীষ্টীয় পুরোহিতশ্রেণী সাধারণতঃ অ্যাডভেণ্ট (Advent) রবিবার অর্থাৎ খ্রীষ্টমাসের পূর্বের চতুর্থ রবিবার হইতে বর্ষারম্ভ ধরিতেন। মধ্যযুগে ফরাসী দেশে ১লা মার্চ বর্ষারম্ভ ধরা হইত; পূর্ব খ্রীষ্টানভূমি ও ভিনিসে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই প্রথাই প্রচলিত ছিল, কিন্তু পিসা ও ফ্লোরেণ্টাইন দেশের লোকেরা ২৫শে মার্চ হইতে বৎসরের গণনা আরম্ভ করিত। ইতালি দেশে পোপ দ্বাদশ ইনোসেণ্ট (Innocent XII) নির্দেশ দিলেন যে ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১লা জানুআরি হইতে বর্ষারম্ভ ধরিতে হইবে, দ্বিতীয় ফিলিপ্স ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নেদারল্যাণ্ডে এইরূপ বর্ষারম্ভ প্রচলন করিয়াছিলেন। এবং খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর পূর্বে জুলিয়াস সিজারও এইরূপ নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু ইতালীয় দেশগুলির প্রায় সর্বত্র ১লা জানুআরি বৎসরের আরম্ভের দিন বলিয়া গণ্য হইল ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে। ইংলণ্ড ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে এই বর্ষারম্ভ প্রথম গ্রহণ করিল।

হিন্দুদিগেরও পঞ্জিকায় বর্ষারম্ভ যে বহুবার পরিবর্তিত হইয়াছে তাহার অনেক প্রমাণ আছে। প্রাচীন বৈদিক যুগে সূর্য যখন বিষুববিন্দুতে অধিষ্ঠিত হইত তখন হইতে বর্ষারম্ভ হইত, তাহার পর অন্য ক্রান্তিপাত হইতে বর্ষারম্ভ ধরা হইত। পঞ্জিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঋতুনির্ণয়, এই কারণে অয়নাংশের জন্য-মেষক্রান্তির অপসরণে পরিবর্তনের প্রয়োজন হইত। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের (১৫০০ খ্রীঃ পূঃ) সময়ে এক বার বর্ষারম্ভের পরিবর্তন হইয়াছিল, তখন ঋতুগুলি ১৪ দিন সরিয়া গিয়াছে; সুতরাং বর্ষারম্ভ পূর্ণিমা হইতে না ধরিয়া অমাবস্যা হইতে ধরা হইল।

আর এক বার ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহিরের সময়ে বর্ষারম্ভের পরিবর্তন হইয়াছিল।

ইহুদীদিগের পঞ্জিকায় সূর্যাস্তের সঙ্গে দিনের আরম্ভ এবং শনিবারের রাত্রি হইতে সপ্তাহের আরম্ভ ধরা হইত। বর্ষারম্ভ গণনা করা হইত মীন-ক্রান্তিপাতের (২২শে সেপ্টেম্বরের) পরের অমাবস্যা হইতে। উহাদের পঞ্জিকা চান্দ্র দিন ও চান্দ্র মাস লইয়া গঠিত। প্রাচীন ময়-সভ্যতার সময়ে বৎসর আরম্ভ হইত মকরক্রান্তি হইতে, বৎসরে ১৮ মাস ধরা হইত, এবং ইহাদের সহিত জ্যোতিষের কোন সম্পর্ক ছিল না। প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের ধারণা যে উহাদের পঞ্জিকা খ্রীষ্টপূর্ব চতুস্ত্রিংশৎ শতাব্দী হইতে প্রচলিত ছিল। মুসলমানদিগের হিজিরা পঞ্জিকায় সূর্যাস্ত হইতে দিনের আরম্ভ করা হইয়াছে, দিন ও রাত্রি উভয়কেই ১২ ঘণ্টায় বিভক্ত করা হইয়াছে, ঘণ্টার পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি ঋতু পরিবর্তনের উপর নির্ভর করিত, সপ্তাহ আরম্ভ হইত রবিবার হইতে, মাস চান্দ্র ছিল এবং উহার আরম্ভ হইত অমাবস্যায়, বৎসর সম্পূর্ণ চান্দ্র ৩৫৪ বা ৩৫৫ দিনে। সুতরাং চতুর্থ বৎসরে এক মাস যোগ করিতে হইত।

এইরূপে যখন বর্ষারম্ভ, মাস ও দিন সংখ্যার নির্ণয় হইল, তখন বৎসরের সংখ্যা ঠিক করিবার জন্য একটা অব্দ স্থির করার প্রয়োজন দেখা দিল। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ শকাব্দই ব্যবহৃত হইল, এক বিখ্যাত শকসম্রাটের সিংহাসনারোহণের সময় হইতে এই অব্দ ধরা হইল, উহা খ্রীষ্টাব্দের ৭৮ বৎসর কম। বাংলা দেশে বঙ্গাব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহার আরম্ভ ৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। ইওরোপে রোমক ব্যবস্থা মানিয়া প্রথম যুগে সম্রাটের রাজত্ব আরম্ভের সময় হইতে বৎসরের সংখ্যা গণিত হইত, পরে ৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ডাইয়োনিসিয়াসের (Dionysius Exignus)

ব্যবস্থায় খ্রীষ্টের কাল্পনিক জন্মতারিখ হইতে অব্দের আরম্ভ স্থির হইল। এই অব্দ রোমে ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৃহীত হইল এবং পরে সমগ্র ইওরোপে প্রচলিত হইল। মুসলমানদিগের অব্দ হজরত মোহম্মদের সময় হইতে ধরা হইয়াছে। হিজিরা অব্দ হইতে, খ্রীষ্টাব্দ বাহির করিতে হইলে উহার বর্ষসংখ্যাকে ৯৭ দিয়া গুণ করিয়া, গুণফল ১০০ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলের সহিত ৬২২ যোগ দিতে হইবে, অর্থাৎ ১৩০০ হিজিরাব্দ = $\frac{৯৭ \times ১৩০০}{১০০}$ + ৬২২ বা ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। ফরাসী বিপ্লবের ইওরোপে আর একটি অব্দ প্রচলিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, উহা ১৭৯২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ করা হইবে স্থির হইয়াছিল।

কালের প্রধান বিভাগগুলির মধ্যে দিনই সহজপ্রাপ্য; সুতরাং দিনই কালপরিমাপের একক (unit) বলিয়া গণ্য হইল। বহুকাল ধরিয়া ইহাকে অপরিবর্তনীয় মনে করা হইত। যেমন মনুষ্যজাতির জ্ঞানবৃদ্ধি হইতে লাগিল নানা-প্রকারের দিনের পার্থক্য দেখা দিল। প্রথমে অপরিবর্তনশীলতার দিক হইতে নাক্ষত্রিক দিনই ব্যবহারের যোগ্য বলিয়া মনে হইল। একটি স্থির নক্ষত্র উহার ধ্রুবের চতুর্দিকে যে সময়ে এক বার পরিক্রমণ শেষ করে সেই সময়কেই নাক্ষত্রিক দিবস বলা হইল, ইহা আধুনিক সময়ের অনুপাতে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪০·৯ সেকেণ্ড। সাধারণ পর্যবেক্ষকের নিকট সৌর দিনই সহজ মনে হইল, সূর্য এক বার মাধ্যাহ্নিকে দেখা দিয়া পুনরায় মাধ্যাহ্নিকে দেখা দিতে যে সময় লইবে, সেই সময়ের ব্যবধানকে সৌর দিন ( true solar ) বলা হইল। কিন্তু এই যে দিন উহা ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনশীল। সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ দিন ও সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র দিনের মধ্যে ব্যবধান ৫১ সেকেণ্ড অথচ সাধারণ ব্যবহারের জন্য সৌর দিন বহু শতাব্দী চলিয়া আসিল এবং সূর্যঘড়ি দিয়া সময়ের পরিমাপের ব্যবস্থা হইল। তারপর যখন আধুনিক

ঘটিকা যন্ত্রের প্রচলন হইল, তখন আর এক প্রকার দিনের ব্যবহার আরম্ভ হইল, উহা হইল এক বৎসরের সৌর দিনগুলির একটা গড় ( mean ) এবং এই দিনকে গড় সৌর দিন নাম দিয়া একটা অপরিবর্তনীয় দিনের মাপ পাওয়া গেল। ইহার পরিমাপ হইল ২৪ ঘণ্টা ৩ মিনিট ৫৬'৫৬ সেকেণ্ড নাক্ষত্রিক দিনের অনুপাতে। নানা দেশের নানা পঞ্জিকায় আরও বহুবিধ দিনের উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্যাবিলনবাসীদের দিন আরম্ভ হইত সূর্যোদয় হইতে; প্রাচীন হিন্দুরা সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন, মধ্যরাত্র, এমনকি সূর্যাস্ত হইতেও দিনের আরম্ভ ধরিতেন, কিন্তু প্রধানতঃ সূর্যোদয় হইতে ধরিতেন। এথেন্সবাসীরা, ইহুদীরা, অন্যান্য প্রাচীন অনেক জাতি, এমন কি কোন কোন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় সূর্যাস্ত হইতে দিনের গণনা করিতেন। রোম ও মিসর দেশের পুরোহিত-সম্প্রদায় মধ্যরাত্র হইতে দিনের আরম্ভ ধরিতেন।

দিনের পরই যে-কালবিভাগের কথা প্রথমে মনে আসে, তাহা মাসের ব্যবস্থা। প্রথমে এক অমাবস্যা বা এক পূর্ণিমা হইতে পরের অমাবস্যা বা পূর্ণিমার ব্যবধান সময়কে মাস বলা হইত। ইহা সকল প্রাচীন জাতিই ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া ইহা কাল-বিভাগের একটা বিশিষ্ট পরিমাপক বলিয়া গণ্য হইত। পরে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল দিন যেমন বহু প্রকারের, মাসও তেমন বহু প্রকারের। প্রথম, নাক্ষত্রিক মাস, অর্থাৎ যে সময়ে স্থির নক্ষত্রের অবস্থিতির তুলনায় চন্দ্র একবার পৃথিবীর চারি ধারে ঘুরিয়া আসে, ইহার পরিমাপ ছিল ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট ১১'৫ সেকেণ্ড; দ্বিতীয় চান্দ্র মাস, অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্যের দুইটি যুতি ( conjunction ) কালের মধ্যে ব্যবধান, ইহার গড় পরিমাপ ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ৩ সেকেণ্ড অর্থাৎ নাক্ষত্রিক মাস হইতে ২ দিন ৫ ঘণ্টা ৫১'৫ সেকেণ্ড

বেশী। যাঁহারা চান্দ্র পঞ্জিকা মানিতেন, তাঁহাদের মধ্যে ইহা প্রচলিত ছিল। ইহাকেই ভিত্তি করিয়া প্রথমে বার মাসে বৎসর ধরা হইত।

দিন ও মাসের ব্যবস্থা স্থির হইলে বৎসরের পরিমাপের চেষ্টা হইল। নাক্ষত্রিক বৎসর ও সৌর বৎসর দুই প্রকারের বৎসরের প্রচলন হইল। একটি স্থির নক্ষত্রের অবস্থানানুসারে সূর্যকে একবার যে স্থানে দেখা যাইত, পুনরায় সেই স্থানে সূর্যকে দেখা যাইবার যে সময়ের ব্যবধান উহাকে এক নাক্ষত্রিক বৎসর বলা হইত, আর যে সময়ে সূর্য বিষুববিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া আবার বিষুববিন্দুতে ফিরিয়া আসিত, উহাকে ধরা হইত এক সৌর বৎসর। কিন্তু যে বৎসর জনসাধারণে ব্যবহার করে, তাহার সংখ্যা ৩৬৫ দিন ; আর সূর্যের রাশিচক্রে পরিভ্রমণের সময় ৩৬৫$\frac{1}{8}$ দিন। ইহাদের সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

সর্ব্বশেষ কাল-বিভাগ হইল সপ্তাহ। সম্ভবতঃ দিনের অপেক্ষা দীর্ঘ এবং মাসের অপেক্ষা অনেক কম এক কাল-বিভাগের প্রয়োজন হইয়াছিল। কেলডিয়ান যাজক-সম্প্রদায়ই ইহার ব্যবস্থা করেন এবং এই কাল-বিভাগ এখন সকল জাতির মধ্যে ব্যবহৃত হইতেছে। সাতটি গ্রহের নামানুসারে উহাদের নামকরণ হইয়াছে।

সকল প্রাচীন পঞ্জিকায় বারো ঘণ্টায় দিন ও বারো ঘণ্টায় রাত্রি ধরা হইত। কেন যে বারো সংখ্যা ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। কেহ কেহ বলেন যে বৎসরের মাস সংখ্যা বারো বলিয়া দিনের ঘণ্টার সংখ্যাও বারো, কিন্তু এই ধারণা কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ ব্যাবিলন-বাসীরা এই সংখ্যা সর্বপ্রথমে স্থির করেন। কেহ কেহ বলেন দ্বাদশ সংখ্যা হইতে ভগ্নাংশ বাহির করিতে সুবিধা হইত বলিয়াই এই সংখ্যার প্রচলন হইল। প্রাচীন জাতির সকলেই দেখিলেন যে গ্রীষ্মকালে দিনের ঘণ্টা রাত্রির ঘণ্টার অপেক্ষা দীর্ঘতর এবং শীতকালে ইহার বিপরীত।

ইহার পর সময় নির্ধারণ করিতে ব্যাবিলন, মিসর ও ভারতবর্ষে সূর্যঘড়ির ব্যবস্থা হইল। কিন্তু সূর্যের অবস্থানের সহিত ইহার যোগাযোগ থাকায়, সূর্য না উঠিলে বা রাত্রিকালে সময়ের পরিমাপ করিতে জলঘড়ির ব্যবহার আরম্ভ হইল। এই সকলের উদ্ভাবন হইতেই বর্তমান ঘটিকাযন্ত্রের সৃষ্টি হইল। বোথিয়াস্ই (Boethius, 480—525 A. D.) প্রথমে রোমদেশে ইহার প্রবর্তন করেন এবং ৬১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ধর্মযাজক-সম্প্রদায় কর্তৃক ইহা ব্যবহৃত হইল। বর্তমান সময়ে প্রচলিত ঘড়ির আবিষ্কার হইল ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানতঃ হিউজেন্সের (Huygens) চেষ্টায়।

এই কালবিভাগের ধারার আলোচনা কালে হিন্দুপঞ্জিকার একটা বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। হিন্দুগণ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে ও কল্পনাবলে অনন্ত কাল হইতে ক্ষুদ্রতম কাল বিভাগ লইয়া একটা তালিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এখন উহাদের প্রয়োজনীয়তা তত থাকুক আর নাই থাকুক, উহাতে যে ধারাবাহিকভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে, ইহাই যথেষ্ট প্রশংসনীয়। দিন ও মাসকে ভিত্তি করিয়া কল্প পর্যন্ত বৃহত্তম কাল এবং নিমেষ পর্যন্ত ক্ষুদ্রতম কালাংশ হিন্দুপঞ্জিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে—"সূর্যই দিনরাত্রিবিভাগের কর্তা। ইহা দুই প্রকারের, এক মানুষের জন্য, আর এক দেবতাদের জন্য। দিন জীবের কার্যের জন্য, রাত্রি নিদ্রার জন্য। মানুষের এক মাস পিতৃদিগের এক অহোরাত্র; উহা আবার দুইভাগে বিভক্ত, জ্যোৎস্নাপক্ষ তাহাদের কার্যের জন্য, কৃষ্ণপক্ষ তাঁহাদের নিদ্রার জন্য। মানুষের এক বৎসর দেবতাদিগের এক অহোরাত্র; উহাও দুইভাগে বিভক্ত, উত্তরায়ণ কাল তাহাদের দিন এবং দক্ষিণায়ন কাল

তাহাদের রাত্রি। দেবতাদের চারি হাজার বৎসর কৃত বা সত্য যুগ, উহার আরম্ভ ও শেষাংশ প্রত্যকটি চারিশত বৎসর। পরবর্তী তিনটি যুগ ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যথাক্রমে দেবতাদের তিন হাজার, দুই হাজার ও এক হাজার বৎসর এবং উহাদের আরম্ভ ও শেষাংশ যথাক্রমে তিনশত, দুইশত ও একশত বৎসর। এই চারিযুগের সমষ্টি ব্রহ্মার এক দিন, ব্রহ্মার রাত্রিও ইহার সম পরিমাণ। ইহার ৭১ গুণ সময় অর্থাৎ দেবতাদিগের ১২ হাজার বৎসরের ৭১ গুণ সময় মন্বন্তর কাল; অসংখ্য মন্বন্তরের মধ্য দিয়া বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় চলিতেছে।" পরবর্তী কালে জ্যোতিষগ্রন্থে প্রাণিজগতের বৎসরের অনুপাতে যুগের এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। সূর্যসিদ্ধান্তের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে—"বার সৌর মাসে এক সৌর বৎসর, ইহাতে দেবতাদিগের এক দিন। দেবতাদিগের অহোরাত্র অসুরদিগের রাত্রি ও দিন, অর্থাৎ দেবতাদিগের (উত্তরমেরুবাসী) যখন দিন, অসুরদিগের (দক্ষিণমেরুবাসী) তখন রাত্রি, আর দেবতাদিগের রাত্রি অসুরদিগের দিন। এমন তিনশত ষাট অহোরাত্র দেবতা ও অসুরদের এক বৎসর। এইরূপ বার হাজার বৎসরে এক চতুর্যুগ—কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির সমষ্টি। এই চার যুগ, উহাদের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ (আরম্ভ ও শেষ) লইয়া ৪,৩২০,০০০ সৌর বৎসর; ইহার দশভাগের চার, তিন, দুই ও এক ভাগ যথাক্রমে কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ, উহাদের ষষ্ঠাংশ যুগের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ অর্থাৎ আরম্ভ ও শেষাংশ; এই চারি যুগ মিলিয়া এক মহাযুগ; ৭১টি মহাযুগ অর্থাৎ ৩০৬,৭২০,০০০ সৌর বৎসর এক মন্বন্তর কাল অর্থাৎ এক মনুর স্থিতিকাল, ইহার শেষে ১,৭২৮,০০০ সৌর বৎসর (কৃতযুগের সৌর বৎসরের পরিমাণ) উহার সন্ধিকাল; এইরূপ ১৪ মন্বন্তর উহাদের সন্ধিকাল লইয়া এক কল্প, ইহার আরম্ভে উহার পঞ্চদশ সন্ধিকাল কৃতযুগের সমবৎসর।" কাল পরিমাপে

কল্পের উল্লেখ পরবর্তী সময়ের পুরাণ ও সংহিতায় থাকিলেও বেদের কোথায়ও নাই। কল্পের গঠনে একটা বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। ১ কল্প = ১৪ মন্বন্তর + ১ কৃত যুগ = ১৪ (৭১ মহাযুগ + ১কৃত) + ১কৃতযুগ; এক মহাযুগ = ১০ × ৪৩২,০০০ বৎসর; কৃত = ৪ × ৪৩২,০০০ বৎসর; এক মন্বন্তর = ৭১০ × ৪৩২,০০০ + ৪ × ৪৩২,০০০ বৎসর; সুতরাং এক কল্প = (১৪ × ৭১৪ + ৪) × ৪৩২,০০০ বৎসর = ৪৩২০,০০০,০০০। ব্রেণেণ্ড প্রভৃতি কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন যে ৭১৪ গুণক লওয়ার মধ্যে অয়নাংশের বিচার রহিয়াছে, অর্থাৎ ৭১৪ বৎসরে ১০ ডিগ্রি অয়নাংশ, আর এক বৎসরে ৫০'৪ সেকেণ্ড; সুতরাং এইরূপভাবে কল্পের গঠন একান্ত আকস্মিক নহে, আয়নাংশের যথাযথ পরিমাণ নূতনভাবে ব্যাখ্যা করাই উহার উদ্দেশ্য ছিল।

মহাযুগ ও যুগের উল্লেখ বেদ, সংহিতা ও ব্রাহ্মণে রহিয়াছে। কাল-পরিমাপক হিসাবে যুগের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে বারবার করা হইয়াছে। সংহিতা ও ব্রাহ্মণে কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগেরই উল্লেখ আছে। ইহা ভিন্ন বেদাঙ্গজ্যোতিষ ও বৈদিক সাহিত্যে পাঁচ (বা ছয়) বৎসরের একটা কালচক্রের উল্লেখ আছে, উহাকেও যুগ বলা হইয়াছে। এই বৎসরগুলির আবার বিশেষ নাম দেওয়া হইয়াছিল, যথা সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, ইদ্বৎসর ও বৎসর (বা অনুবৎসর)। প্রায় স্থলেই এই পাঁচ বৎসরের উল্লেখ থাকিলেও, কোথাও কোথাও চার বৎসর এমন কি ছয় বৎসরেরও উল্লেখ আছে; ষষ্ঠ বৎসরের নাম দেওয়া হইয়াছিল ইদুবৎসর। এই পাঁচ বা ছয় বৎসরের যুগেরও উদ্দেশ্য ছিল পাঁচ বা ছয় বৎসর অন্তর একটা অধিক মাস বা মলমাস যোগ দেওয়া।

এইবার দিনকে ভিত্তি করিয়া নিম্নদিকে কি কালবিভাগ হইয়াছিল তাহাই দেখা যাউক। দিনকে কখন প্রাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও সায়াহ্ন,

এই চার ভাগে এবং কখন বা উষা, সংগব (যে সময়ে দোহনের জন্ত গাভীদিগকে লওয়া হইত), মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও সায়াহ্ন এই পাঁচভাগে বিভক্ত করা হইত। পরে দিনকে ১৫ মুহূর্তে এবং রাত্রিকেও ১৫ মুহূর্তে বিভাগ করা হইল; মুহূর্তকে আবার ১৫ প্রতিমুহূর্তে বিভাগ করা হইল; কাষ্ঠা, কলা, নিমেষ প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্রতম বিভাগ করা হইল। মহাভারতে অহোরাত্রকে লব, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। আরও অন্যান্য বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা নাড়িকা (২ নাড়িকা = ১ মুহূর্ত) পল, মাষ, দ্রোণ, আড়ক প্রভৃতি। অথর্ববেদে এইরূপ কালবিভাগ দেওয়া হইয়াছে—এক অহোরাত্র = ৩০ মুহূর্ত; এক মুহূর্ত = ১৫ প্রতিমুহূর্ত বা ৩০ ক্রটি; এক ক্রটি = ৩০ কলা; ১ কলা = ৩০ লব; এক লব = ১২ নিমেষ।

কালবিভাগে ঊর্ধ্বতম ও নিম্নতম বিভাগ উদ্ভাবন করিতে হিন্দুগণ বিশেষ মস্তিষ্কচালনা করিয়াছিলেন। এইরূপ বিভাগ আর কোন দেশের পঞ্জিকায় পাওয়া যায় না। ইহাদের অধিকাংশের এখন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোনও উপযোগিতা না থাকিলেও নিমেষ পর্যন্ত নিম্নতম বিভাগে আসিতে বিশেষ কালজ্ঞানের পরিচয়ে দিতে হইয়াছিল।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে কিরূপে কালবিভাগের উৎপত্তি ও প্রচলন আরম্ভ হয় এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে কিরূপ ভাবে উহাদের সূচনা ও প্রবর্তন হইয়াছিল, তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক কালবিভাগের ক্রমিক ধারার একটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। সকল জাতির পঞ্জিকায় এই কালবিভাগ একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭, জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

। ১৩৫১ ।

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯ ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১ ধনবিজ্ঞান · অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২ শিল্পকথা · শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩ বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪ মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
৩৫ বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ